সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ
মিশর রহস্য
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সাইকেল চালানো শেখার জন্য সন্তুকে এখন ভোরবেলা বালিগঞ্জ লেকে আসতে হয়। ওদের পাড়ার পার্কটা মেট্রো রেলের জন্য খুঁড়ে ফেলা হয়েছে, সেখানে এখন খেলাধুলো করার উপায় নেই।

ভোরবেলাতেই বালিগঞ্জ লেকে বেশ ভিড় থাকে। বহু বয়স্ক লোক আসেন মর্নিং ওয়াক করতে। অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা দৌড়য়। অনেকে রোয়িং করে। কালীবাড়ির উল্টো দিকের গ্রাউণ্ডটায় ফুটবলের কিক প্র্যাকটিস হয়। লেকের পেছনদিকটায় যেখানে লিলিপুল আছে, সেখানকার রাস্তাটা অনেকটা নির্জন। ওই জায়গাতেই দু'তিনটে দল সাইকেল শেখে।

সাড়ে পাঁচটার সময় সন্তু বেরিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে। সঙ্গে থাকে রকুকু। সন্তুর নিজের সাইকেল নেই। কুনালদের বাড়িতে একটা পুরনো সাইকেল ছিল। কুনালের বাবা ডাক্তার, তাঁর চেম্বারের কম্পাউণ্ডারবাবু এই সাইকেলটা ব্যবহার করতেন। কম্পাউণ্ডারবাবু চাকরি ছেড়ে দেশে চলে গেছেন তিন-চার মাস আগে, সাইকেলটা নিয়ে যাননি। কুনাল সেই সাইকেলটা নিয়ে কিছুদিন প্যাড্‌ল করতে করতে চালানো শিখে গেছে। সেই

দেখাদেখি সন্তুরও সাইকেল শেখার শখ হয়েছে।

কুনালকে ডাকতে হয় না, সে তৈরি হয়েই থাকে। কিন্তু মুশকিল হয় বাপিকে নিয়ে। বাপিদের বাড়িতে সবাই খুব দেরি করে ওঠে। ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করলেও কেউ সাড়া দেয় না। সন্তু আর কুনাল যখন রাস্তা থেকে বাপির নাম ধরে ডাকতে থাকে, তখন রকুকুও ঘেউঘেউ করতে শুরু করে দেয়।

শেষ পর্যন্ত বাপি চোখ মুছতে মুছতে দোতলার বারান্দায় এসে বলে, "এক মিনিট দাঁড়া, বাথরুম থেকে আসছি।"

তারপরেও বাপি পনেরো মিনিট কাটিয়ে দেয়। লেকে পৌঁছতে-পৌঁছতে রোদ উঠে যায়।

খুব ছেলেবেলায় সন্তু ট্রাইসাইকেল চালিয়েছিল, কিন্তু দু' চাকার সাইকেল চালানো খুব শক্ত ব্যাপার। একটু-একটু ভয়ে গা-শিরশির করে। সাইকেলটায় ওঠার পর কুনাল আর বাপি তাকে দু'দিকে ধরে থেকে ঠেলতে থাকে। তারপর দু'জনে নির্দেশ দেয়, জোরে প্যাড্‌ল কর, সামনে তাকিয়ে থাক্, শরীরটা হাল্‌কা কর, এত স্টিফ হয়ে আছিস কেন?

কুনাল আর বাপি হঠাৎ একসময় তাকে ছেড়ে দিলেই সন্তুর চোখে সমস্ত পৃথিবীটাই যেন দুলতে থাকে, হাত দুটো লগ্‌বগ্ করে। সন্তু চেঁচিয়ে ওঠে, "এই, এই পড়ে যাব, ধর, ধর!"

ওরা দু'জন হাসতে-হাসতে দৌড়ে এসে আবার ধরে ফেলে।

এই রকম দু'দিন ধরে চলছে। আজ তৃতীয় দিন। আজ সন্তুর অনেকটা ভয় কেটে গেছে। সাইকেলে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা আর আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে না। বাপি আর কুনাল মাঝে-মাঝে ছেড়ে দিচ্ছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আজ এখানে আরও চারটে দল এসেছে, এক দলের সঙ্গে আর-এক দলের

যে-কোনও সময় ধাক্কা লেগে যেতে পারে। উল্টোদিকে অন্য কোনও দলকে দেখলেই সন্তু নার্ভাস হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট ছোটাছুটি করার পর একসময় বাপি সন্তুর পিঠে চাপড় মেরে বলল, "এইবার তুই নিজে চালা, সন্তু। এই কুনাল, ছেড়ে দে!"

সন্তুর আর হাত কাঁপল না, সে সোজা সাঁ-সাঁ করে বেরিয়ে গেল। দারুণ আনন্দ হচ্ছে সন্তুর, চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে, 'শিখে গেছি; শিখে গেছি!' চিৎকার করার বদলে সন্তু ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে লাগল।

কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আবার সব বদলে গেল। আবার হাত কাঁপছে, হ্যাণ্ডেলটা এদিক-ওদিক ঘুরে যাচ্ছে, পায়ে যেন জোর কমে গেছে। সন্তুর ধারণা হল, সে একা-একা অনেকটা দূরে এসে গেছে, কুনাল আর বাপি দৌড়ে এসে তাকে ধরতে পারবে না। কী হবে? এই রে, এই রে, সাইকেলটা হেলে যাচ্ছে...

পেছন থেকে বাপি চেঁচিয়ে বলল, "ভাল হচ্ছে, চালিয়ে যা সন্তু, সামনের দিকে তাকিয়ে—"

ঠিক এই সময়ে বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে আর-একটা দল এসে পড়ল। এখন পাশ কাটাতে না-পারলেই মুখোমুখি কলিশান। সন্তু মোটে সোজা চালাতে শিখেছে, এদিক-ওদিক ঘুরতে জানে না। কুনাল বলেছিল, সাইকেলে সব সময় বাঁ দিকে টার্ন নেওয়ার চেষ্টা করবি, ডান দিকে হঠাৎ টার্ন নেওয়া ডিফিকাল্ট। কিন্তু এখানে বাঁ দিকে টার্ন নিতে গেলে যে সোজা লেকের জলে নেমে যেতে হবে।

উল্টোদিকের দলটা সন্তুর একেবারে কাছে এসে চেঁচিয়ে সাবধান করে দিল, "বাঁ দিক চেপে...বাঁ দিক চেপে!"

সন্তু আর কিছু চিন্তা না করে ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল হ্যাণ্ডেল।

পরের মুহূর্তটা সে চোখে কিছু দেখতে পেল না। কী যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল পৃথিবীতে। একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে সন্তু ছিটকে পড়ে গেল, তারপর সাইকেলটাও পড়ল তার ঘাড়ের ওপর।

কোনওরকম ব্যথা বোধ করার আগেই সন্তু ভাবল, চোখ দুটো ঠিক আছে তো ? পায়ের হাড় ভেঙে গেছে ?

রকুকু ছুটে আসছিল সন্তুর পেছন পেছন। সাইকেলটা পড়ে যেতে দেখে সে ভয় পেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল।

সাইকেলটা সরিয়ে সন্তু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। একজন মর্নিং ওয়াকার সাইকেলটা তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলেন, "খুব লেগেছে নাকি, খোকা ? আমার হাত ধরে ওঠবার চেষ্টা করো।"

ততক্ষণে কুনাল আর বাপি এসে পৌঁছে গেল সেখানে।

কুনাল বলল, "এই ওঠ্, তোর কিচ্ছু হয়নি !"

বাপি বলল, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার/সাইকেল শেখে না কেহ না খেলে আছাড় !"

মর্নিং ওয়াকার ভদ্রলোক বললেন, "না হে, ওর বেশ ভালই লেগেছে মনে হচ্ছে, হাঁটুর কাছে রক্ত বেরোচ্ছে !"

কুনাল বলল, "আমার ওর থেকে ঢের বেশি রক্ত বেরিয়েছিল। সাইকেল শিখবে, আর একবারও রক্ত বেরুবে না ?"

ভদ্রলোকটি আবার হাঁটা শুরু করে দিলেন।

কুনাল আর বাপি দু'হাত ধরে সন্তুকে টেনে তুলল। কুনাল বলল, "সাইকেলটা টাল খেয়ে গেছে শুধু, আর কিছু হয়নি ভাগ্যিস !"

সন্তু মাঝে-মাঝে ফুলপ্যান্ট পরলেও সাইকেল চালাবার জন্য পরে এসেছে শর্টস আর গেঞ্জি। তার একটা হাঁটুর নুন-ছাল উঠে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে ফোঁটা ফোঁটা। সেখানে খানিকটা জ্বালা করলেও আসল ব্যথা হচ্ছে সন্তুর বাঁ পায়ের গোড়ালিতে।

এক পা চলার চেষ্টা করেই সন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠল। যন্ত্রণায় প্রায় চোখে জল এসে গেল তার।

বাপি বলল, "কী রে, তুই এত সব বিপদের মধ্যে অ্যাডভেঞ্চার করতে যাস, আর সামান্য একটু পায়ের ব্যথায় কেঁদে ফেললি?"

সন্তু বলল, "ভীষণ লাগছে, মাটিতে পা ফেলতে পারছি না।"

কুনাল বলল, "জোর করে হাঁটার চেষ্টা কর, একটু বাদে ঠিক হয়ে যাবে!"

সন্তু বলল, "যদি ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে?"

কুনাল বলল, "ধ্যাত, অত সহজে ফ্র্যাকচার হয় না।"

রকুকু আবার এর মধ্যে সন্তুর পা চেটে দিতে চায়। সন্তু কুনালকে বলল, "ওর গলার চেনটা বেঁধে নে।"

এর পর আর সাইকেল চালাবার প্রশ্ন ওঠে না। কুনাল সাইকেলটা ঠিক করে নিল। বাপির কাঁধে ভর দিয়ে সন্তু হাঁটতে লাগল খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। তার সত্যি খুব কষ্ট হচ্ছে। সে দাঁতে দাঁত চেপে আছে, কোনও কথা বলছে না।

খানিকক্ষণ চলার পর বাপি বলল, "কী রে, তুই যে এখনও ল্যাংচাচ্ছিস? জোর করে বাঁ পাটা ফেলার চেষ্টা কর।"

সন্তু ধরা গলায় বলল, "কিছুতেই পারছি না। হাড় ভেঙে গেছে নিশ্চয়ই।"

বাপি হাসতে হাসতে বলল, "যাঃ, তা হলে কী হবে? তুই তো আর কোনও অ্যাডভেঞ্চারে যেতে পারবি না। তোর কাকাবাবুর একটা পা তো, ইয়ে, মানে ডিফেকটিভ। তুই যদি খোঁড়া হয়ে

যাস, তা হলে তো তোকে আর উনি সঙ্গে নেবেন না !"

কুনাল বলল, "এই বাপি, ওরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলিস না। ওর পা আবার ঠিক হয়ে যাবে।"

সন্তুর মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বাপি তো ঠিকই বলেছে। সে খোঁড়া হয়ে গেলে তো কাকাবাবুকে আর কোনও সাহায্য করতে পারবে না ! তার জীবনের সব কিছু শেষ হয়ে গেল ?

খানিকটা পথ পার হবার পর কুনাল জিজ্ঞেস করল, "একটা রিকশায় উঠবি, সন্তু ?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নাড়ল। বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলে মা ভয় পেয়ে যাবেন। আগেই মাকে কিছু বলার দরকার নেই। বিমানদার দাদা ডাক্তার, তাঁকে দেখিয়ে নিতে হবে একবার।

সন্তুদের বাড়ির কাছেই বিমানদাদের বাড়ি। বিমানদা পাইলট, তিনি বাড়ি নেই, নিউ ইয়র্কে গেছেন। বিমানদার দাদাও নার্সিং হোমে চলে গেছেন জরুরি কল পেয়ে। দুপুরবেলা তিনি বাড়িতে খেতে আসেন, সেইসময়ে সন্তুকে আবার আসতে হবে।

কাছেই একটা স্টেশনারি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন কাকাবাবু, কী যেন কিনছেন। ক্রাচ না নিয়ে কাকাবাবু হাঁটতে পারেন না, তবু প্রত্যেক দিন সকালে তাঁর মর্নিং ওয়াকে বেরুনো চাই।

সন্তু প্রথমে কাকাবাবুকে দেখতে পায়নি। বাপি তার কাঁধে চাপ দিয়ে বলল, "এই সন্তু, দ্যাখ..."

সন্তু মুখ ফিরিয়ে দেখল কাকাবাবু তার দিকেই চেয়ে আছেন। সন্তুকে খোঁড়াতে দেখে তিনি মিটিমিটি হাসছেন, মুখে কিছু বললেন না !

অন্য যে-কোনও বাড়ির বাবা-কাকারা তাঁদের বাড়ির ছেলেকে এইরকম অবস্থায় দেখলে দারুণ ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে বলতেন, "অ্যাঁ, কী হয়েছে? কী করে পড়লি? হাড় ভেঙে গেছে?" ইত্যাদি ইত্যাদি। কাকাবাবু সন্তুকে ওই অবস্থায় দেখে পাত্তাই দিলেন না।

এমন কী, একটু বাদে বাড়ি ফিরেও কাকাবাবু মাকে কিছুই বললেন না।

সন্তু নিজের ঘরে গিয়ে চুপ করে বসে রইল। এখন দু'তিন ঘণ্টা তার পড়ার সময়, ঘর থেকে না বেরুলেও চলবে। ব্যথাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাঁ পায়ের গোড়ালির কাছটা বেশ ফুলে গেছে। একটু আয়োডেক্স মালিশ করলে হত। আয়োডেক্সের একটা টিউব ছিল যেন বাড়িতে কোথায়, কিন্তু দরকারের সময় তো সে-সব খুঁজে পাওয়া যাবে না। মায়ের কাছেও চাইতে সাহস পাচ্ছে না। সন্তু জানে, মা জানতে পারলে এক্ষুনি কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন, তারপর এক্স-রে, তারপর আরও কত কী! পায়ে প্লাস্টার করিয়ে শুইয়ে রাখবেন এক মাস। ওই প্লাস্টার জিনিসটা সন্তু একদম পছন্দ করে না! এক মাস বিছানায় শুধু-শুধু শুয়ে থাকা...অসহ্য!

বিমানদার দাদা অবনীদা নিজে খেলাধুলো করেন। তিনি নিশ্চয়ই একটা সহজ ব্যবস্থা করে দেবেন। মা সকালের দিকে অনেকটা সময় স্নান আর রান্না নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, সহজে টের পাবেন না।

বেলা এগারোটা আন্দাজ সন্তু বারান্দায় খটখট শব্দ পেয়ে বুঝল কাকাবাবু আসছেন তার ঘরে। পড়ার টেবিল থেকে সন্তু মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

দরজার সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস

করলেন, "কী রে, বাড়িতে কাউকে কিছু বলিসনি তো ? পা যদি ভেঙে গিয়ে থাকে, তা হলে কি এমনি-এমনি সারবে ?"

সন্তু কী উত্তর দেবে ভেবে পেল না।

কাকাবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "এদিকে আয়, হাঁটবার চেষ্টা কর, দেখি কতদূর কী হয়েছে !"

কাকাবাবু গুরুজন হয়ে তার পায়ে হাত দেবেন, এটা ভেবে সন্তু আপত্তি জানাতে যাচ্ছিল। কিন্তু আপত্তি জানিয়েও কোনও লাভ নেই।

সন্তু এক পায়ে লাফাতে লাফাতে চলে এল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু বসে পড়ে সন্তুর বাঁ পাটা দু' হাতে ধরলেন। সন্তুর গা শিরশির করছে। ওইখানটায় হাত দিলেই ব্যথা।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, বেশ ফুলেছে দেখছি !"

তারপর পা'টা বেশ জোরে চেপে ধরে সন্তুর চোখে চোখ রেখে বললেন, "শোন্, যতই ব্যথা লাগুক, চ্যাঁচানো চলবে না কিন্তু। দেখি কী রকম তোর মনের জোর। মন শক্ত করেছিস তো ? এক...দুই...তিন !"

কাকাবাবু স্যাট করে সন্তুর গোড়ালিটা ঘুরিয়ে দিলেন। সন্তুর মুখখানা মস্ত বড় হাঁ হয়ে গেল, তবু সে কোনও শব্দ করল না। মনে হল যেন কাকাবাবু তার পায়ের হাড় ভেঙে দিলেন মট্ করে।

কাকাবাবু বললেন, "যা, ঠিক হয়ে গেছে, আর কিছু হবে না।"

সন্তু প্রকাণ্ড বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করে বলল, "ঠিক হয়ে গেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "মট্ করে একটা শব্দ পেলি না ? তাতেই তো হাড় আবার সেট হয়ে গেল। তোর গোড়ালিটা একটু ঘুরে

গিয়েছিল।"

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, "আমি অনেককাল পাহাড়ি লোকেদের মধ্যে কাটিয়েছি তো। সেখানে তো ডাক্তার পাওয়া যায় না, ওরা এইরকমভাবে চিকিৎসা করে। আমি ওদের কাছ থেকে শিখেছি।"

সন্তুর চোখ অটোমেটিক্যালি কাকাবাবুর পায়ের দিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, "তুই ভাবছিস তো আমার পা'টা কেন এইভাবে সারাতে পারিনি? আমার পায়ের ওপর এই অ্যাত্তো বড় একটা পাথরের চাঁই এসে পড়েছিল, এখানকার হাড়গোড় একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। পা'টা যে কেটে বাদ দিতে হয়নি তাই যথেষ্ট। তুই এবারে একটু হাঁটার চেষ্টা করে দ্যাখ্ তো!"

আশ্চর্য ব্যাপার, পায়ে এখনও ব্যথা আছে যদিও, তবু সন্তু দু'পা ফেলে হাঁটতে পারছে।

কাকাবাবু বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ঠিক হয়ে গেছে। তবু একবার বিমানের দাদার কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিস।"

গরমের ছুটি, তাই স্কুল-কলেজ বন্ধ। সারাদিন সন্তু বাড়িতেই বসে রইল। পায়ের ব্যথা ক্রমশই কমে যাচ্ছে আর সন্তুরও মন ভাল হয়ে উঠছে। বিকেলে অবনীদার চেম্বারে যাবার পর তিনি ওর পা দেখে বললেন, "কই, কিছু হয়নি তো। একটু-আধটু মচকে গেলে চিন্তার কী আছে? বাড়িতে গিয়ে মাকে বলো একটু চুন-হলুদ গরম করে ওখানটায় লাগিয়ে দিতে।"

পরদিন ভোরবেলা সন্তুর ঘরের দরজায় খটখট শব্দ হল। দরজা খুলে সন্তু দেখল কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সাড়ে পাঁচটা বেজে গেল, আজ আর সাইকেল শিখতে যাবি না?"

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সাইকেল? সাইকেল শেখার চিন্তা তো সে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলেছে। ওই অপয়া সাইকেলটার জন্যই তো কাল তাকে অত কষ্ট পেতে হল। কী হয় সাইকেল শিখে? এটা গাড়ির যুগ। আর একটু বড় হয়ে সন্তু গাড়ি চালানো শিখবে।

সন্তু বলল, "আমি আর সাইকেল শিখব না, কাকাবাবু!"

কাকাবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেন? সাইকেল কী দোষ করল? তুই পড়ে গেছিস, সেটা তো সাইকেলের দোষ নয়। কিছু একটা শিখতে শিখতে মাঝপথে ছেড়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়।"

সন্তু তবু গাঁইগুঁই করে বলল, "পায়ে এখনও একটু-একটু ব্যথা, যদি আবার লেগেটেগে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "আবার লেগে গেলে আবার সারবে। সাইকেল শেখাটা ভয় পেয়ে একবার ছেড়ে দিলে আর শেখা হবে না। যা, যা, বেরিয়ে পড়! সাইকেলটা একবার শিখে নিলে দেখবি ভবিষ্যতে কত কাজে লাগবে!"

সন্তু ভেবেছিল, আজ বেশ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকবে। কাকাবাবুর তাড়নাতে তাকে বেরিয়ে পড়তেই হল। কুনালের বাড়ির দিকে যেতে-যেতে সে ভাবল, কাকাবাবু সাইকেল শেখার ওপর এত জোর দিচ্ছেন কেন? এবারে যেখানে যাওয়া হবে, সেখানে কি সাইকেল চালানো দরকার হবে?

সন্তুর মন বলছে, শিগগিরই কোথাও যাওয়া হবে। লম্বা, ফর্সা মতন একজন বুড়োলোক প্রায়ই আসছেন কাকাবাবুর কাছে। লোকটি ঠিক সাহেব নয়, আবার ভারতীয় বলেও মনে হয় না। লোকটি কাকাবাবুকে কোথাও নিয়ে যেতে চান। সন্তু একদিন শুনতে পেয়েছিল, বুড়ো লোকটি ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে বলছেন,

"ইউ কাম্... আই উইল মেক অল অ্যারেঞ্জমেন্টস্ ।"

কাকাবাবু বলেছিলেন, "দাঁড়ান, যাওয়াটা ওয়ার্থহোয়াইল হবে কি না আগে চিন্তা করে দেখি ?"

লোকটি যে কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন, সেটা সন্তু বুঝতে পারেনি। লোকটি কি কাশ্মীরি ? কিংবা কাবুলের লোক ?

দিদির বন্ধু স্নিগ্ধাদির বর সিদ্ধার্থদা কলেজে পড়ানোর কাজ ছেড়ে ফরেন সার্ভিসে যোগ দিয়েছেন। এখন বাইরে-বাইরে থাকেন। সেই যে সেবার কাশ্মীরে কনিষ্কর মুণ্ডু উদ্ধার করার ব্যাপারে সিদ্ধার্থ অনেক সাহায্য করেছিলেন, তারপর থেকে আর অনেকদিন সিদ্ধার্থদার সঙ্গে সন্তুর দেখাই হয়নি। সিদ্ধার্থদারা কয়েক বছর কাটালেন বেলজিয়ামে, তারপর সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন কানাডায়। আবার যেন কোথাও বদলি হয়েছেন, সেই ফাঁকে বেড়াতে এসেছেন কলকাতাতে।

স্নিগ্ধাদি একদিন এসেছিলেন সন্তুদের বাড়িতে। দিদি তো এখানে নেই, দিদি এখন ভূপালে। মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প করার পর স্নিগ্ধাদি সন্তুকে নেমন্তন্ন করলেন তাঁদের বাড়িতে।

সিদ্ধার্থদা আবার শখের ম্যাজিশিয়ান। খাওয়া-দাওয়ার পর সিদ্ধার্থদা ম্যাজিক দেখাতে লাগলেন কয়েকটা। সন্তু অনেক ম্যাজিকের বই পড়েছে, সিদ্ধার্থদার সব কটা ম্যাজিকই সে ধরে ফেলতে পারত। কিন্তু ম্যাজিকের আসরে ওরকম করা উচিত নয় বলে সে চুপ করে রইল। শেষকালে একটা তাসের ম্যাজিকে

সিদ্ধার্থদা একটুখানি ভুল করে ফেলায় সন্তু আর হাসি চাপতে পারল না !

সিদ্ধার্থদা বললেন, "এই, তুমি হাসলে কেন ? দেখবে, তোমার জামার পকেট থেকে আমি একটা মুরগির ডিম বার করে দেব ?"

স্নিগ্ধাদি বললেন, "আহা, তোমার যা পচা-পচা ম্যাজিক, সন্তু ঠিক ধরে ফেলেছে !"

সিদ্ধার্থ ভুরু কুঁচকে সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সন্তু মানে ? দা গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার ? আমি তো ওকে চিনতেই পারিনি, অনেক বড় হয়ে গেছে !"

ম্যাজিক দেখানো বন্ধ করে সিদ্ধার্থদা সন্তুকে কাছে ডেকে নানান গল্প শুরু করে দিলেন। এক সময় তিনি বললেন, "জানো সন্তু, কানাডায় আমাদের এমব্যাসির ছেলেমেয়েদের জন্য একদিন 'সবুজ দ্বীপের রাজা' সিনেমাটা দেখানো হল। তুমি আর কাকাবাবু যে একেবারে আন্দামানে জারোয়ারদের মধ্যে চলে গিয়েছিলে, আমি তো জানতুমই না ! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছিলে। আমি একেবারে থ্রিল্‌ড !"

সন্তু লাজুক-লাজুক মুখ করে রইল।

সিদ্ধার্থদা জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর আর কোথাও গিয়েছিলে ?"

সন্তু তাদের অভিযানের কাহিনী শোনাতে লজ্জা পায়। সে বলল, "এই, আরও দু'এক জায়গায়..."

সিদ্ধার্থদা বললেন, "আমার এবার পোস্টিং কোথায় জানো তো ? ইজিপ্টে। কাকাবাবুকে বলো না, সেখানে একবার চলে আসতে ? সেখানেও তো কত রহস্যময় ব্যাপার আছে, পিরামিড, স্ফিংকস, মরুভূমি..."

স্নিগ্ধাদি বললেন, "হ্যাঁ, চলো এসো, বেশ মজা হবে, আমরাও

থাকব।”

সন্তু বলল, “শুধু আমি যেতে চাইলেই তো হবে না। কাকাবাবু অন্য একটা কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন।”

কয়েকদিন আগে কাকাবাবু চলে গেছেন দিল্লিতে। সন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোনও উচ্চবাচ্যই করেননি। যাওয়ার দিন সন্তুই নিজে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, “কাকাবাবু, আমাকে নিয়ে যাবেন না ?”

কাকাবাবু বলেছিলেন, “না রে, তুই গিয়ে কী করবি ? আমি যাচ্ছি সরকারি কাজে। প্লেনে যাব, প্লেনে আসব, কোনও অসুবিধে তো নেই !”

কিন্তু সন্তুর সন্দেহ হয়েছিল, দিল্লি থেকে কাকাবাবু আর যাবেন। সেই ফর্সা, লম্বা বৃদ্ধ লোকটি এয়ারপোর্টে যাওয়ার সময় তুলে নিতে এসেছিলেন কাকাবাবুকে। সন্তুর বেশ মন খারাপ হয়েছিল।

সন্তুর আবার মন খারাপ হয়ে গেল, যখন শুনল যে, স্নিগ্ধাদির বোন রিনিও এবারে ওঁদের সঙ্গে যাবে ইজিপ্টে। রিনি সন্তুর চেয়ে মাত্র এক বছরের ছোট, এ-বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। সে দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে ছুটি কাটাতে যাচ্ছে। রিনি সন্তুর আগেই ফরেন কান্ট্রিতে যাচ্ছে ? সন্তু এ-পর্যন্ত বিদেশ বলতে শুধু নেপাল ঘুরে এসেছে। অবশ্য নেপালও খুব সুন্দর জায়গা।

সন্তুর আবার যেতে ইচ্ছে করে।

রিনি বলল, “সিদ্ধার্থদা, ইজিপ্ট থেকে গ্রিস তো খুব দূরে নয় ! আমাকে একবার গ্রিস ঘুরিয়ে আনবেন তো ?”

সিদ্ধার্থদা বললেন, “হ্যাঁ, গ্রিস তো ঘুরে আসাই যায়। ইচ্ছে করলে আমরা রোমেও যেতে পারি। আমার রোম দেখা হয়নি।”

গ্রিস, রোম, এইসব নাম শুনলে সন্তুর রোমাঞ্চ হয়।

আলেকজাণ্ডার, জুলিয়াস সিজার এইসব নাম মনে পড়ে।

সন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এল।

সামনে অনেকদিন ছুটি, সন্তুর আর সময়ই কাটতে চায় না। কুনাল চলে গেছে ওর মামাবাড়ি ভাগলপুরে। বাপিও দার্জিলিং যাবে-যাবে করছে। খেলাধুলো জমছে না। বাড়িতে যত বই ছিল, সবই সন্তুর পড়া, নতুন বই আর যোগাড় করা যাচ্ছে না।

কিছু একটা করতে হবে তো। একদিন দুপুরবেলা খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সন্তু ঠিক করল, সে একা একাই এবার থেকে এক-একটা রহস্য সমাধানের চেষ্টা করবে। কাকাবাবুর যদিও অনেকের সঙ্গেই চেনাশুনো, তবু কাকাবাবুও তো বিশেষ কারও সাহায্য নিতে চান না।

ক'দিন ধরেই কাগজে একটা খবর বেরুচ্ছে। তিলজলায় একটা পুকুরে এক সপ্তাহের মধ্যে দুটি ছেলে ডুবে গেছে। কিন্তু তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কেউ জলে ডুবে গেলে কিছুক্ষণ বাদে তার মৃতদেহটা ভেসে উঠবেই। পুকুরটা বেশি বড় নয়। অথচ পোর্ট কমিশনার্সের পেশাদার ডুবুরিরাও কয়েক ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করে ছেলে দুটির কোনও চিহ্ন দেখতে পায়নি।

ছেলেদুটিকে ডুবে যেতে অনেকেই দেখেছে। ঘটনা দুটিই ঘটেছে বিকেলবেলা। গরমের দিনে এই সময় অনেকেই ওই পুকুরে স্নান করতে আসে। ওই ছেলেদুটি জলে নামল, আর উঠল না, তা হলে ওরা গেল কোথায়? অনেকে বলছে, ওই পুকুরের তলায় নিশ্চয়ই গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। অনেক কালের পুরনো পুকুর, সেই নবাবি আমলের। পেশাদার ডুবুরিরা অবশ্য কোনও সুড়ঙ্গের কথা বলেনি। এতদিন ওই পুকুরে অনেকেই স্নান করছে, কারও কিছু হয়নি, হঠাৎ এক সপ্তাহের মধ্যেই দুটি ছেলে অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?

সন্তু মনে-মনে এই কেসটা টেক আপ করে নিল।

তিলজলা জায়গাটা কোথায়? সন্তু কোনওদিন ওই নামের জায়গায় যায়নি, তার চেনা কেউ ওখানে থাকেও না। তিলজলা কী করে খুঁজে পাওয়া যায়? কুনাল ওর সাইকেলটা সন্তুর কাছে রেখে গেছে। ইচ্ছে করলে সন্তু এখন সাইকেলে কলকাতার যে-কোনও অঞ্চলে চলে যেতে পারে।

রাস্তার মোড়ে একটা বই-পত্রপত্রিকার স্টল আছে। সেই স্টলের মালিক গুপিদা বেশ ভালমানুষ ধরনের। সন্তু ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় থেকেই এই স্টল থেকে ম্যাগাজিন, কমিক্স, গল্পের বই কেনে। গুপিদা তাকে চেনেন।

সন্তু সেই স্টল থেকে কলকাতার একটা ম্যাপ কিনে পাশের দেওয়ালে মেলে ধরল। কিন্তু তাতেও সে তিলজলা খুঁজে পায় না। কী ব্যাপার, তা হলে কি তিলজলা কলকাতার মধ্যে নয়, বাইরে কোথাও?

গোল-গোল নিকেলের ফ্রেমের চশমার ফাঁক দিয়ে গুপিদা চেয়ে ছিলেন সন্তুর দিকে। চোখাচোখি হতেই তিনি বললেন, "ভাল, নিজের শহরটাকে ভাল করে চেনা উচিত প্রত্যেকেরই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "গুপিদা, তিলজলা জায়গাটার নাম খুঁজে পাচ্ছি না কেন?"

গুপিদা বললেন, "পাচ্ছ না? পিকনিক গার্ডেনস দ্যাখো, তার পাশেই পাবে।"

সন্তু অবাক। পিকনিকের জন্য বাগান, সেখানে সবাই পিকনিকের জন্য যায়? সন্তু তো এরকম কোনও জায়গার নামই শোনেনি।

গুপিদা ওর হাত থেকে ম্যাপটা নিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "এই দ্যাখো, ভবানীপুর, এই হাজরা

মোড়, এই হল বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, তারপর এই বণ্ডেল রোড ধরে সোজা গেলে রেল-লাইনের লেভেল ক্রসিং পাবে, তার ওপারে... ।

বেলা এখন চারটে। সঙ্গে আর কাউকে নিলে হত। বাপিকে ডাকবে ? কিন্তু বাপির এইসব ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। থাক, সন্তু একাই যাবে। সাইকেলটা না নিয়ে যাওয়াই ভাল। লোকের চোখে পড়ে যাবে। সন্তু হাঁটতে শুরু করে দিল।

বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গেল সহজেই। লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল বণ্ডেল রোড কোন্‌টা। কতদিনই সন্তু একলা-একলা রাস্তা দিয়ে হাঁটে। কিন্তু আজকে একেবারে অন্যরকম লাগছে। আজ সন্তু এমন একটা কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যার কথা পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। সন্তুর কি মুখ দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে ? রাস্তার প্রায় সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে কেন ?

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে অন্য দিকে চলে এল সন্তু। যেন কলকাতা নয়, যেন অন্য একটা নতুন জায়গায় বেড়াতে এসেছে সে। যদিও জায়গাটাতে নতুনত্ব কিছু নেই, ভাঙা, ঘিঞ্জি রাস্তা, বাস আর সাইকেল-রিকশা চলছে।

খানিকদূর এগোবার পর আর-একটা সমস্যা মাথায় এল সন্তুর। কোন্ পুকুরে ছেলেদুটো ডুবে গিয়েছিল, তা কী করে বোঝা যাবে ? তিলজলাতে কি একটাই পুকুর আছে ? পিকনিক গার্ডেনস তার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে ? কত বড় বাগান ? সেখানেও নিশ্চয়ই পুকুর থাকবে ! ঘটনাটা কি সেখানেই ঘটেছিল ?

সন্তু একটা সাইকেল-রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

চালক জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাবেন ?"

সন্তু বলল, "পিকনিক গার্ডেনে।"

সাইকেল-রিকশার চালক একটু বিরক্তভাবে বলল, "অ্যাঁ ? এটাই তো পিকনিক গার্ডেন।"

সন্তু রাস্তার চারপাশে বাড়িগুলোর দিকে তাকাল। কোনও বাগান তো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। পুকুর কোথায় ?

সন্তুর মনে হল, ইনভেস্টিগেটর হতে গেলে আগে সব রাস্তা-টাস্তাগুলো ভাল করে চেনা দরকার। এবার থেকে সে নিয়মিত কলকাতার বিভিন্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "এখানে একটা পুকুর আছে ?"

চালক বলল, "একটা কেন, অনেক গণ্ডা পুকুর আছে। কোথায় যাবেন সেটা বলুন না। ঠিকানা কী ?"

সন্তু বলল, "ঠিকানাটা মনে নেই, আমার পিসিমার বাড়ি, কাছেই একটা পুকুর আছে...ওই যে যে-পুকুরে দুটো ছেলে ডুবে গেছে..."

চালক আর বাক্যব্যয় না করে প্যাড্‌ল ঘোরাল।

একটু বাদেই বড় রাস্তা ছেড়ে সাইকেল-রিকশাটা ঢুকল একটা মাঝারি রাস্তায়। কয়েকবার ডান-দিক বাঁ-দিক ঘুরে সেটা এসে থামল একটা পুকুরের সামনে।

চালক জিজ্ঞেস করল, "এবারে চেনা লাগছে ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, ওই তো ওই কোণের বাড়িটা !"

ভাড়া পেয়ে সাইকেল-রিকশার চালক চলে গেল উল্টো দিকে। কোনও কারণ নেই, তবু সন্তুর বুকটা এত ঢিপঢিপ করছে। এই সেই পুকুর, যার মধ্যে রহস্যময় কিছু আছে, যে দুটো ছেলেকে টেনে নিয়েছে, আর ফিরিয়ে দেয়নি।

পুকুরটা বেশ বড়ই। কালো রঙের জল। মাঝখানটায় কিছু কচুরিপানা রয়েছে, তাতে সুন্দর হালকা-নীল রঙের ফুলও ফুটেছে। পুকুরটার তিনদিকেই বাড়ি, একটা দিক ফাঁকা।

সেখানে খানিকটা ঝোপঝাড়ের মতন হয়ে আছে, তারপর খানিকটা দূরে একটা কারখানা।

সন্তু ভেবেছিল যে, এখানে অনেক লোকজন দেখতে পাবে। পুলিশ, দমকল, খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফার...। কিন্তু কেউই নেই। খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, এই জায়গাটা বুঝি ভিড়ে-ভিড়াক্কার হয়ে গমগম করছে! একটা লোকও স্নান করছে না পুকুরে। রাস্তা দিয়ে দু'চারজন লোক যাচ্ছে, কিন্তু কারও কোনও কৌতূহল আছে বলেও মনে হয় না।

পুকুরটার জলের দিকে তাকিয়ে মিনিট পাঁচেক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সন্তু। কাকাবাবু হলে কী করে এই রহস্যটার সমাধান করতেন? খবরের কাগজ পড়লে মনে হয়, ডুবুরিরা কিছু খুঁজে পায়নি বলে পুলিশ হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু ছেলেদুটো তো জলের তলায় অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে না!

যে-জায়গায় কোনও ঘটনা ঘটে, সে-জায়গাটা কাকাবাবু নিজের চোখে দেখতে যান সব সময়। খবরের কাগজ পড়েই তো তিনি সুন্দরবনের নদীতে খালি জাহাজটা দেখতে গিয়েছিলেন। এখানে এসে কি কাকাবাবু জলে নেমে পড়তেন? পায়ের জখমের জন্য কাকাবাবুর সাঁতার দিতে অসুবিধে হয়। তা হলে? কাকাবাবু নিশ্চয়ই সন্তুকে বলতেন জলে নামতে।

সন্তু ভাল সাঁতার জানে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এই রকম একটা পুকুর, কালো মিশমিশে জল, এখানে নামার কথা ভাবতেই সন্তুর ভয়-ভয় করছে। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে কক্ষনো ভয় করে না। খোঁড়া পা দিয়ে কাকাবাবু নিজে কত সাংঘাতিক বিপদের দিকে এগিয়ে যান, শুধু মনের জোরে।

একটা লোকও এই পুকুরের জলের ধারেকাছে নেই। সবাই ভয় পেয়েছে? একটা পুকুরের জলে ভয়ংকর কী থাকতে পারে?

খবরের কাগজে লিখেছে, ডুবুরিরা জল তোলপাড় করে কিছুই দেখতে পায়নি। কোনও গোপন সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা কোনও অদ্ভুত জন্তু লুকিয়ে আছে ?

শুধু-শুধু জলের দিকে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। ফিরে যাবে ? কিছুই করা গেল না ? প্রথম কেস হাতে নিয়েই সন্তু হেরে যাবে ? যদিও কেউ জানে না, তবু সন্তুর লজ্জা লাগছে।

পুকুরটার চারপাশটা অন্তত একবার ঘুরে দেখা দরকার। রাস্তার ঠিক উল্টো দিকটায় যেখানে ঝোপঝাড় রয়েছে, সেখানে কি কোনও ঘাট আছে ? ছেলে দুটো ডুব-সাঁতারে ওপারে গিয়ে ওই ঝোপের মধ্যে যদি লুকিয়ে থাকে, তাহলে অনেকেই ভাবতে পারে ওরা ডুবে গিয়ে আর ওঠেনি। মজা করার জন্য ছেলেদুটো এরকম করতেও পারে।

সন্তু পুকুরের পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তিনদিকে তিনটে ঘাট আছে, তার মধ্যে একটা ঘাট বেশ বড়, থাক-থাক ইটের সিঁড়ি, দু'পাশে বসবার জায়গা।

যে-দিকটায় ঝোপঝাড়, সেই দিকটা বেশ নোংরা। বোধহয় কারখানার লোকেরা তাদের আবর্জনা এই দিকে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফেলে। ভাঙা কাচ, চায়ের খুরি, ময়লা ন্যাকড়া ছড়িয়ে আছে অনেক। অনেক বড়-বড় ঘাস গজিয়ে গেছে এখানে। একটা বা দুটো ছেলে ইচ্ছে করলে অনায়াসেই এই ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে।

এই জায়গাটার মাটি থসথসে, কাদা-কাদা। চার-পাঁচদিন আগেও যদি কেউ এ-দিকটায় এসে থাকে তাহলে তার পায়ের চিহ্ন এখনও পাওয়া যাবে। একটা বেশ গর্তও রয়েছে, কেউ মাটি কেটে নিয়ে গেছে। সন্তু এদিক-ওদিক তীক্ষ্ণ নজর রেখে হাঁটতে লাগল। হঠাৎ সে দেখতে পেল, এক জায়গায় একটা হলদে

রঙের জামা পড়ে আছে। জামাটা দেখে খুব পুরনো বলে মনে হয় না। সন্তুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এখানে একটা জামা এল কী করে ?

জামাটার খানিকটা রয়েছে ঝোপের মধ্যে, খানিকটা জলে ডুবে আছে। সন্তু পা টিপে-টিপে এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে জামাটা তুলতে যেতেই এক কাণ্ড হল।

পায়ের তলার নরম মাটি ধসে গিয়ে সন্তু হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল জলে। ভাল সাঁতারু হলেও সে ভয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। তার মনে হল, কুমিরের চেয়েও সাংঘাতিক কোনও জন্তু এক্ষুনি তাকে কামড়ে দেবে !

সে-রকম কিছুই হল না। প্রথম পড়ার ঝোঁকে সন্তু চলে গেল অনেকখানি জলের মধ্যে। পুকুরটা খুব খাড়া আর পিছল, পা রাখা যায় না। ডুবজল থেকে উঠে আসবার পর দাঁড়াবার চেষ্টা করেও তার পা হড়কে যেতে লাগল বারবার। তারপর সে সাঁতরে পারের কাছে এসে এক গোছা ঘাস মুঠো করে ধরল, অমনি সেখানকার মাটিও খসে পড়ল।

কয়েকবার এরকম চেষ্টা করার পর সন্তু উঠে এল ওপরে। জামা প্যান্ট একেবারে জবজবে ভিজে, জুতো কাদায় মাখামাখি। মাথায় শ্যাওলা জড়িয়ে গেছে। জামার পকেটে দু'খানা দু'টাকার নোট ছিল, সে দুটি বুঝি গেছে একেবারে।

একটা গোলমাল শুনে সন্তু মুখ তুলে তাকাল। পুকুরের ওপারে রাস্তার ধারে একদল লোক জমেছে সবাই সন্তুকেই দেখছে আর কী যেন বলাবলি করছে। তারপর তারা দৌড়ে আসতে লাগল এদিকে।

তারা কাছাকাছি আসতেই সন্তু শুনতে পেল, কয়েকজন চেঁচিয়ে বলছে, 'মরা ছেলে ফিরে এসেছে ! মরা ছেলে ফিরে এসেছে !

সুড়ঙ্গ দিয়ে পাতালপুরীতে চলে গিয়েছিল !'

এ-কথা শুনে সন্তুর চোখ বড়-বড় হয়ে গেল। এই রে, এরা কি ভেবেছে, জলে-ডোবা দুজন ছেলের মধ্যে সে একজন ? তিন-চার দিন পর কেউ জলের তলা থেকে ফিরে আসতে পারে ? এ কি রূপকথা নাকি ?

লোকগুলো সন্তুকে ঘিরে ধরে এমন চ্যাঁচামেচি করতে লাগল যে, সন্তু কোনও কথাই বলতে পারল না। অনেকেরই ধারণা, সন্তু

সেই ডুবে যাওয়া ছেলেদের একজন। কয়েকজন অবশ্য সন্দেহ প্রকাশ করল যে, এর পায়ে জুতো রয়েছে কেন ? জুতো পরে তো কেউ সাঁতার কাটতে নামে না। তাদের কথায় বিশেষ কেউ পাত্তা দিচ্ছে না। একজন বেশ গলা চড়িয়ে বলল, "আমিই তো প্রথম দেখেছি, মাঝপুকুরে ভুশ করে জল ঠেলে উঠল, তারপর সাঁতরে-সাঁতরে এই দিকে চলে এল।"

ক্রমশই বেশি ভিড় জমছে। মজা দেখবার জন্য পাড়ার

ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ির বউরাও ছুটে আসছে। কেউ বলল, 'ওর মুখ শুকিয়ে গেছে, ওকে দুধ খাওয়াও !' কেউ বলল, 'পুলিশে খবর দাও !' কেউ বলল, 'খবরের কাগজের ফোটোগ্রাফারকে ডাকো।'

একজন বয়স্কমতন ভারিক্কি চেহারার লোক সন্তুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "এই যে খোকা, তুমি সন্ধেবেলা এখানে কী করছিলে ? কোথা থেকে এলে ?"

সন্তু উত্তর দিতে পারল না।

'লোকটি বলল, "মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। তিন দিন ধরে এই পুকুরের জল কেউ ছোঁয় না, অথচ একটা ছেলে জল থেকে উঠে এল ?"

সন্তু এবারে কোনওক্রমে বলে উঠল, "আমি পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম !"

বয়স্ক লোকটি বিকট গলায় হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর। সন্তুকে ওরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। পাতালপুরীতে সন্তু কী দেখেছে, তা বলবার জন্য খোঁচাতে লাগল অনেকে। এর মধ্যে এসে পড়ল পুলিশ। সন্তুকে নিয়ে চলল থানায়।

সন্তু এসেছিল গোয়েন্দাগিরি করতে, তাকে থানায় যেতে হল চোরের মতন।

থানার বড়বাবু ভিড় হাটিয়ে একা সন্তুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বড়বাবুর গায়ের রঙ খুব ফর্সা, মাথায় অল্প-অল্প টাক, দেখলে মনে হয় সিনেমার পুলিশ। তিনি ভুরু নাচিয়ে বললেন, "নাও, লেট মি হিয়ার ইওর সং ! তুমি জামা-প্যান্ট-জুতো পরে পুকুরে ডুব দিয়েছিলে কেন ?"

সন্তু বলল, "বলছি, আগে এক গেলাস জল খাব !"

সন্তুর গলা একেবারে শুকিয়ে কাঠ। কত দুর্গম জায়গায় কত রকম বিপদ কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। কিন্তু আজ কলকাতা শহরের মধ্যেই সে যে বিপদে পড়েছে, তার সঙ্গে আগের কোনও কিছুরই তুলনা হয় না। লোকগুলো যদি তাকে মারতে শুরু করত ? থানায় এসে সে অনেক নিরাপদ বোধ করছে।

জল খাবার পর সন্তু মুখ তুলতেই বড়বাবু বললেন, "নাও, মাই বয়, আমি সত্যি কথা শুনতে চাই, নাথিং বাট দা ট্রুথ..."

বড়বাবুর কথার মাঝখানেই সন্তু বলল, "আপনি স্পেশাল আই. জি. মিঃ আর. ভট্টাচার্য কিংবা ডি. আই. জি. ক্রাইম মিঃ বি. সাহাকে একবার ফোন করবেন ?"

কথা বলতে-বলতে থানার বড়বাবুর মুখখানা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ভুরু নাচাতে ভুলে গেলেন।

সেই রকম অবস্থায় প্রায় এক মিনিট থেমে থেকে তিনি বললেন, "কাদের নাম বললে ? স্পেশাল আই. জি কিংবা ডি. আই. জি. ? এঁদের ফোন করব কেন ?"

সন্তু বলল, "ওঁরা দু'জনেই আমার কাকাবাবুকে চেনেন। আমাকেও চেনেন। পুলিশ কমিশনারও একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন।"

বড়বাবু হাঁক দিলেন, "বিকাশ ! বিকাশ !"

আর-একজন পুলিশ অফিসার উঁকি মারতেই বড়বাবু বললেন, "ওহে বিকাশ, এ ছেলেটি যে বড়-বড় কথা বলে ! লম্বা-লম্বা পুলিশ অফিসারদের নাম করছে।"

সন্তু বলল, "আপনারা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবেন না। আমার পরিচয়টা জানলে আপনাদের সুবিধে হবে। সেইজন্য আমি ওঁদের ফোন করতে বলছি।"

বিকাশ নামের কালো, লম্বা চেহারার পুলিশ অফিসারটি বলল,

"তোমার গল্পটা কী আগে শুনি ?"

সন্তু বলল, "ওই পুকুরটায় নাকি দুটো ছেলে ডুবে গেছে, তাদের আর পাওয়া যায়নি, সেইজন্য আমি পুকুরটা দেখতে এসেছিলুম।"

"তারপর জামা-জুতো পরে জলে নেমে গেলে ?"

"ইচ্ছে করে নামিনি। পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম।"

বড়বাবু বললেন, "তা তো হতেই পারে। পা পিছলে কি কেউ জলে পড়ে যেতে পারে না ?"

বিকাশ বলল, "স্যার, বাইরে অনেক লোক ভিড় জমিয়ে আছে। হই-হল্লা করছে। তারা এত সহজ গল্প বিশ্বাস করবে না !"

বড়বাবু রেগে উঠে বললেন, "তাদের জন্যে কি রোমহর্ষক গল্প বানাতে হবে ? মহা মুশকিল ! এ-ছেলেটি বড় বড় পুলিশ অফিসারদের নাম করছে, যদি সত্যিই তাঁদের সঙ্গে চেনা থাকে ? ফোন করো ! ফোন করো ! ওকে খোকা,কী নাম তোমার ?"

সন্তু বলল, "আমার কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। তাঁর নাম বলুন। আমাকে সন্তু নামে উনি চিনবেন।"

ফোনে ওই দু'জনের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বড়বাবুর মুখের চেহারাটাই বদলে যেতে লাগল। চোখ দুটো হল গোল-গোল আর ভুরুদুটো উঠে গেল অনেকখানি।

তিনি বলতে লাগলেন, "অ্যাঁ ? কী বলছেন স্যার ? বিখ্যাত ? অ্যাডভেঞ্চার করে ? ওদের নিয়ে বই লেখা হয়েছে ? না স্যার, আমি বই-টই বিশেষ পড়ি না, বই পড়ার সময় পাব কখন ! হ্যাঁ। ছেলেটি আমার সামনেই বসে আছে...আপনাকে দেব, কথা বলবেন ?"

স্পেশাল আই. জি. সাহেব টেলিফোনে হাসতে-হাসতে বললেন, "কী হে সন্তু, তিলজলার পুকুরে ডুব দিতে গিয়েছিলে কেন ? ওখানে কি গুপ্তধন আছে নাকি ?"

সন্তু লাজুকভাবে বলল, "না, মানে এমনিই। পুকুরের ধার দিয়ে হাঁটছিলুম, হঠাৎ পা পিছলে..."

"হঠাৎ ওই পুকুরটার ধার দিয়েই বা হাঁটতে গেলে কেন ? তুমি কি একা-একাই গোয়েন্দাগিরি শুরু করেছ নাকি ?"

"না, এমনিই বেড়াতে এসেছিলুম এদিকে...'"

এরপর বড়বাবু থেকে শুরু করে থানার সমস্ত লোক দারুণ খাতির করতে লাগল সন্তুকে। বাইরের ভিড় হটিয়ে দেওয়া হল। সন্দেশ-রসগোল্লা-শিঙাড়া এসে গেল সন্তুর জন্য। সন্তু খেতে চায় না, তবু ওঁরা ছাড়বেন না।

তারপর পুলিশের গাড়ি সন্তুকে পৌঁছে দিয়ে এল তাদের বাড়ির কাছাকাছি।

সন্তুর মনটা তবু খুব খারাপ হয়ে রইল। লজ্জাও করছে খুব। প্রথমবারেই এরকম ব্যর্থতা। ছি ছি ছি !

বাড়িতে পৌঁছেই সন্তু দেখল একজন অপরিচিত লোক বসে আছেন তাদের বসবার ঘরে। বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন।

ভিজে জামা-কাপড় যাতে কেউ দেখতে না পায় তাই সন্তু পাশের বারান্দা দিয়ে সুট করে উঠে যাচ্ছিল ওপরে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা হাঁক দিয়ে বললেন, "কে রে ? সন্তু নাকি ? এদিকে আয়... শুনে যা !"

"আসছি", বলেই সন্তু এক দৌড়ে চলে গেল ওপরে। তাড়াতাড়ি জামা-প্যান্ট বদলে আবার নীচে নেমে এল।

বাবা বললেন, "কোথায় ছিলি এতক্ষণ ? এই ভদ্রলোক তোর জন্য কখন থেকে বসে আছেন ! দ্যাখ, রাজা তোর নামে চিঠি

পাঠিয়েছে।”

সন্তু তাড়াতাড়ি কাকাবাবুর চিঠিটা নিয়ে খুলল। চিঠিটা এসেছে দিল্লি থেকে। কাকাবাবু লিখেছেন :

স্নেহের সন্তু,

একটা কাজের জন্য দিল্লি এসেছিলাম। দু' চারদিনের মধ্যেই ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পরশু থেকে খুব জ্বরে পড়ে গেছি। বেশ কাবু করে দিয়েছে। কাজটা শেষ না করে ফিরে যেতে চাই না। ভেবেছিলাম এবার তোর সাহায্যের কোনও দরকার হবে না। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, তোকে সঙ্গে আনাই উচিত ছিল। দিন দশেকের জন্য কলকাতা ছেড়ে এলে কি তোর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে ? দাদা আর বৌদিকে জিজ্ঞেস করবি। যদি কোনও অসুবিধে না থাকে, তাহলে আগামীকালই চলে আসতে হবে। যে ভদ্রলোকের হাতে এই চিঠি পাঠাচ্ছি, তিনিই প্লেনের টিকিট পৌঁছে দেবেন। দিল্লি এয়ারপোর্টে তোকে রিসিভ করার জন্য লোক থাকবে। দাদাকেও আলাদা চিঠি দিলাম। ইতি

কাকাবাবু

পুনশ্চ : তোর একটা পাসপোর্ট করানো হয়েছিল, মনে আছে ? সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবি।

চিঠিটা পড়তে পড়তেই সন্তু আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। এতক্ষণের মনখারাপ আর লজ্জা এক নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

বাবার দিকে তাকাতেই বাবা বললেন, “হ্যাঁ, চলে যা ! অসুখে পড়েছে, একা-একা আছে ! কী অসুখ সে-কথাও লেখেনি !”

আগন্তুকটি বললেন, “আমি তাহলে টিকিটের ব্যবস্থা করে রাখছি। কাল বিকেলের ফ্লাইটে...”

ওপরে এসে সন্তু কাকাবাবুর চিঠিখানা যে কতবার পড়ল তার

ঠিক নেই। অতি সাধারণ চিঠি, তবু দুটো জিনিস বোঝা গেল না। কাকাবাবু কোন্ কাজে দিল্লি গেছেন? আর পাসপোর্ট নেবার কথা লিখলেন কেন? দিল্লি যেতে পাসপোর্ট লাগবে কেন?

প্লেনে চড়া সন্তুর পক্ষে নতুন কিছু নয়, তবে আগে কখনও সে একা কোথায় যায়নি। এয়ারবাস-ভর্তি লোক, একজনও সন্তুর চেনা নয়। বেশ কয়েকজন বিদেশিও রয়েছে।

সময় কাটাবার জন্য সন্তু একটা বই এনেছে সঙ্গে, কিন্তু বই পড়ায় মন বসছে না। সে যাত্রীদের লক্ষ করছে। বিমানটা আকাশে ওড়ার খানিক পরেই অনেকে সিট বেল্ট খুলে ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। কারও কারও ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় প্লেনে চড়া তাঁদের কাছে একেবারে জলভাত। মিনিবাসে চেপে রোজ অফিসে যাবার মতন প্লেনে চেপে রোজ দিল্লি বা বোম্বে যান।

কয়েকদিন আগেই শ্রীনগরে একটা প্লেন হাইজ্যাকিং হয়েছে। এয়ারপোর্টে বাবা এসেছিলেন সন্তুকে পৌঁছে দিতে, তিনি বারবার ওই কথা বলছিলেন। বাবা ভয় পাচ্ছিলেন, হঠাৎ যদি প্লেনটা হাইজ্যাকিং হয়ে কোনও বিদেশে চলে যায়, তাহলে সন্তু একা-একা কী করবে!

সন্তুর কিন্তু হাইজ্যাকিং সম্পর্কে মোটেই ভয় নেই। বরং মনে-মনে একটু ইচ্ছে আছে, সেরকম একটা কিছু হলে মন্দ হয় না! এখন সে যাত্রীদের মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করছে, এদের মধ্যে কেউ কেউ কি হাইজ্যাকার হতে পারে? বাথরুমের কাছে

তিনটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে, ওদের মধ্যে দুজনের মুখে দাড়ি, একজন পরে আছে একটা চামড়ার কোট। ওরা যে-কোনও মুহূর্তে রিভলবার বার করতে পারে। চোখের দৃষ্টিও বেশ সন্দেহজনক।

আধঘণ্টার মধ্যেও কিছুই হল না। সন্তু জানালা দিয়ে বাইরে দেখতে লাগল। পাতলা-পাতলা মেঘ ছাড়া আর কিছুই দেখবার নেই। মেঘের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি ভাবলেই মনটা কী রকম যেন হাল্‌কা লাগে।

সন্তু একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ মাইক্রোফোনে কিছু একটা ঘোষণা হতেই সে দারুণ চমকে উঠল। তাহলে কি এবারে শুরু হল নাটক ?

না, সেসব কিছু না। যাত্রীদের অনুরোধ করা হচ্ছে সবাইকে সিটবেল্ট বেঁধে নিজের নিজের জায়গায় বসতে। বাইরে ঝড় হচ্ছে।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে সেই সন্দেহজনক চরিত্রের তিনটি ছেলেকে দেখতে পেল না ! জানলা দিয়ে তাকালেও বাইরে ঝড় বোঝা যায় না।

শেষ পর্যন্ত প্লেন হাইজ্যাকিংও হল না, ঝড়ের জন্য কিছু বিপদও ঘটল না। বিমানটি নিরাপদে এসে পৌঁছল দিল্লিতে।

প্লেন থেকে নেমে সন্তু লাউঞ্জে এসে দাঁড়াবার একটু পরেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা একজন লোক এসে বলল, "এসো আমার সঙ্গে।"

সন্তু একটু অবাক হল। লোকটিকে সে চেনে না। লোকটি তার নামও জিজ্ঞেস করল না। কিন্তু লোকটি এমন জোর দিয়ে বলল কথাটা যে, অমান্য করা যায় না। সন্তু চলল তার পিছু-পিছু।

লোকটি একেবারে এয়ারপোর্টের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে সন্তু বলল, "আমার সুটকেস ? সেটা নিতে হবে যে !"

লোকটি বলল, "হবে। সব ব্যবস্থা হবে।"

বাইরে আর-একজন লোককে আঙুলের ইশারায় ডেকে সেই পাইলটের মতন পোশাক-পরা লোকটি বলল, "একে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসাও, আমি ওর সুটকেসটা পাঠিয়ে দিচ্ছি !"

সন্তু এবারে বলল, "দাঁড়ান, আপনারা কার কাছ থেকে এসেছেন ? আমার নাম কি আপনারা জানেন ?"

প্রথম লোকটি এবারে মুখ ঘুরিয়ে চার দিকটা দেখে নিয়ে বলল, "নাম-টাম বলার দরকার নেই। তোমাকে তোমার কাকাবাবুর কথামতন পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। চট করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ো।"

কাকাবাবুর কথা শুনে সন্তু আর আপত্তি করল না। দ্বিতীয় লোকটির সঙ্গে গিয়ে একটা ফিয়াট গাড়িতে উঠে বসল। একটুক্ষণের মধ্যেই সুটকেসটা দিয়ে গেল একজন, গাড়িটা স্টার্ট নিল।

অনেকদিন আগে কাশ্মীর যাওয়ার পথে সন্তুরা দিল্লিতে নেমেছিল একদিনের জন্য। সেবারে দিল্লি ভাল করে দেখা হয়নি। দিল্লিতে কত কী দেখার আছে। কিন্তু এখন রাত হয়ে গেছে, রাস্তার দু'পাশে বিশেষ কিছু চোখে পড়ছে না।

গাড়িতে যে লোকটি সঙ্গে চলেছে, সে একটাও কথা বলেনি সন্তুর সঙ্গে। বাঙালি কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না।

সন্তু নিজে থেকে যেচে কথা বলতে পারে না অপরিচিত লোকের সঙ্গে। সে-ও চুপ করে রইল। কিন্তু একটু যেন অস্বাভাবিক লাগছে। সে এয়ারপোর্টে পৌঁছতে না পৌঁছতেই যেন তাড়াহুড়া করে নিয়ে আসা হল তাকে। পাইলটের মতন পোশাক

পরা লোকটা কী করে চিনল সন্তুকে ? সে কেন বলল, কোনও নাম বলার দরকার নেই ?

অনেক রাস্তা ঘুরে, একটা আলো-ঝলমলে পাড়ার মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে থামল গাড়িটা। গাড়ির চালক নিজে না নেমে বলল, "আপ উতরিয়ে !"

সন্তু গাড়ি থেকে নামতেই গাড়িটা ভোঁ করে চলে গেল। সন্তু চেঁচিয়ে উঠল, "আরে, আমার সুটকেস !"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন লোক বেরিয়ে এসে বলল, "আপ অন্দর আইয়ে !"

সন্তু বলল, "হামারা সুটকেস লেকে ভাগ গিয়া !"

লোকটি হেসে বলল, "ফিক্‌র মাত কিজিয়ে, সুটকেস পৌঁছে জায়গা !"

লোকটির হাসির মধ্যে যথেষ্ট ভরসা আছে। তাই সন্তু আর কিছু না বলে চলে এল ওর সঙ্গে। লিফ্‌টে পাঁচতলায় পৌঁছে লোকটি একটা ঘরের বন্ধ দরজায় টোকা মারল।

দরজা যিনি খুললেন, তাঁকে দেখে সন্তুর মুখটা খুশিতে ভরে গেল। যাক, তা হলে তাকে ঠিক জায়গাতেই আনা হয়েছে। আর সুটকেসের জন্য চিন্তা করতে হবে না।

ছিপছিপে লম্বা লোকটির নাম নরেন্দ্র ভার্মা। দিল্লিতে সি. বি. আই-এর একজন বড়কর্তা। কাকাবাবুর অনেক দিনের বন্ধু। সন্তুকেও ইনি ভালই চেনেন। এই তো গত বছরেই ত্রিপুরায় ইনি এসেছিলেন কাকাবাবুকে সাহায্য করতে। নরেন্দ্র ভার্মা কলকাতায় লেখাপড়া করেছেন বলে বাংলা মোটামুটি ভালই জানেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এসো, সনটু ! কেমুন আছ ? রাস্তায় গোলমাল হয়নি তো কিছু ? টায়ার্ড ?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "না, একটুও টায়ার্ড নই। আপনি ভাল

আছেন তো ?”

নরেন্দ্র ভার্মা ভুরু কুঁচকে বললেন, “ভাল কী করে থাকব ? তোমার আংকল দিল্লিতে এসে এমুন ঝোন্‌ঝাট বাধাল, অথচ আমি কিছুই জানি না ! আমাকে আগে কোনও খবরই দেয়নি। এ-সব কী বেপার বলো তো ?”

সন্তু আকাশ থেকে পড়ল। সে তো কিছুই জানে না।

ঘরের চার দিকে চোখ বুলিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, “কাকাবাবু কোথায় ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এখানে নেই। সেফ জায়গায় আছে। আচ্ছা সনটু, তুমি বলো তো, আ ক্যাট হ্যাজ নাইন লাইভ্‌স। তোমার এই কাকাবাবুর কখানা জীবন ?”

“কেন, কী হয়েছে আবার ?”

“আরে ভাই, ডেল্‌হিতে আসবার আগে আমাকে একটা চিট্‌ঠি দিল না, এখানে এসে ভি খবর দিল না। আমি খবর পেলাম মার্ডার অ্যাটেম্‌পট্ হবার পর !”

“অ্যাঁ ! মার্ডার অ্যাটেম্‌ট ? কার ওপর ?”

“তোমার কাকাবাবুর ওপর ! আবার কার ? কেন, তোমাকে চিট্‌ঠি লেখেননি ?”

“চিঠিতে তো লিখেছেন, ওঁর জ্বর হয়েছে !”

“হাঁ হাঁ, তা তো লিখবেনই। আসল কথা লিখলে তোমার মা-বাবা বহোত দুশ্চিন্তা করতেন তো ! এবারে বড় রকম ইনজুরি হয়েছে, খুব জোর বেঁচে গেছেন !”

“আমি কাকাবাবুর সঙ্গে এক্ষুনি দেখা করতে চাই।”

“তা হবে না। তোমার কাকাবাবুই বলেছেন, তোমাকে সাবধানে রাখতে। কারা মারল তা তো বোঝা গেল না। তোমার কাকাবাবুর অনেক এনিমি, তবে কে হঠাৎ দিল্লিতে এসে মারতে

যাবে ? রায়চৌধুরী আমাকে বলল, তোমাকেও সাবধানে রাখতে। তোমার ওপর অ্যাটেম্‌ট হতে পারে। রায়চৌধুরীর উপর ডি ফিন্‌ অ্যাটাক হতে পারে...।"

সন্তুর কাঁধে হাত রেখে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বেশি চিন্তা কোরো না। এখন ভাল আছেন তোমার কাকাবাবু। এবারে বলো তো, কী কেস নিয়ে এসেছেন দিল্লিতে ?"

সন্তু বললে, "আপনি জানেন না, আমি জানব কী করে ? আমায় তো কিছুই বলেননি।"

"গর্ভনমেন্টের কোনও কেস হলে আমি ঠিকই জানতুম। সে সব কিছু না। শুনলাম কী একজন আরবের সঙ্গে তোমার কাকাবাবুর খুব দোস্তি হয়েছে।"

"আরব ?"

"হ্যাঁ। মিড্‌ল ইস্টের কোনও দেশের লোক। লোকটাকে আমি দেখিনি এখনও। রায়চৌধুরীও কিছু ভাঙ্‌ছে না আমার কাছে। বলছে, ই সব তোমাদের গভর্নমেন্টের কিছু বেপার নয়।"

"কলকাতাতেও কাকাবাবুর কাছে একজন লোককে আসতে দেখেছি। যাকে দেখে সাহেবও মনে হয় না। ভারতীয়ও মনে হয় না।"

"প্রোবাব্‌লি দ্যাট ইজ আওয়ার ম্যান। লোকটাকে ধরতে হবে। কোন্‌ চক্করে ফাঁসিয়ে দিয়েছে তোমার কাকাবাবুকে।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেছে। দিল্লিতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না, এটা সে চিন্তাই করতে পারেনি।

সে জিজ্ঞাসা করল, "নরেন্দ্রকাকা, আমি কি এখানেই থাকব নাকি ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "না, একঘণ্টা বাদ তোমাকে আর এক

গেস্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হবে। দেখতে হবে কি, তোমায় কেউ ফলো করছে কি না। অন্য গেস্টহাউসে তোমার সুটকেস পেয়ে যাবে।”

“কাকাবাবুর সঙ্গে একবার টেলিফোনে কথা বলা যায় না ?”

“আজ অসুবিধে আছে। কাল হবে। আজ রাতটা ঘুমোও।”

ঘণ্টাখানেক বাদে সন্তুকে আবার আর একটি গাড়িতে চাপিয়ে দিয়ে যাওয়া হল অন্য একটি বাড়িতে। এটা একটা মস্ত বড় গেস্টহাউস। অনেক লোকজন। নরেন্দ্র ভার্মা নিজে সন্তুকে দিয়ে গেলেন একটি ঘরে। সেখানে আগে থেকেই তার সুটকেস রাখা আছে।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “তোমার রাতের খাবার এই ঘরেই এসে যাবে। আর কিছু লাগলে বেল বাজিয়ে ডাকবে বেয়ারাকে। পয়সার চিন্তা কোরো না। আর, আজ রাতটা একলা বাইরে যেও না !”

নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর সন্তু বিছানার ওপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। একটা অচেনা জায়গায় সে একদম একা। কাকাবাবু চিঠি পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনলেন, অথচ কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

গতকাল প্রায় এই সময় সন্তু তিলজলার কাছে একটা থানায় বসেছিল, আর আজ সে দিল্লিতে একটা গেস্টহাউসে। আগামীকাল আবার কী হবে কেউ বলতে পারে না।

রাত্তিরটা এমনিই কেটে গেল। ভাল ঘুম হয়নি সন্তুর, সারা রাত প্রায় বিছানায় শুয়ে ছটফট করেছে। ভোরের আলো ফুটতেই সে বেরিয়ে এল বাইরে।

এখনও অনেকেই জাগেনি। বাড়িটার সামনের বাগানে অনেক রকম ফুল। গেটের বাইরে খুব চওড়া একটা রাস্তা। খুব সুন্দর

একটা সকাল, কিন্তু সন্তুর মনটা খারাপ হয়ে আছে।

সন্তু বড় রাস্তাটায় খানিকটা হেঁটে বেড়াল। বেশি দূর গেল না। দিল্লির রাস্তা সে কিছুই চেনে না।

নরেন্দ্র ভার্মা এলেন ন'টা বাজার খানিকটা পরে। সন্তু তখন নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে। এখানে ব্রেকফাস্টে অনেক কিছু দেয়, ফলের রস, কর্নফ্লেকস, দুধ আর কলা, টোস্ট আর ওমলেট, আর একটা সন্দেশ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী সন্তু, ইউ আর ইন ওয়ান পিস? কেউ তোমাকে গুলি করেনি কিংবা কিডন্যাপ করার চেষ্টাও করেনি?"

সন্তু বলল, "কেউ আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "চলো, তৈয়ার হয়ে নাও। রাজা তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

সন্তুর তৈরি হয়ে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না।

দিনের আলোয় দিল্লি শহরটাকে ভালভাবে দেখল সন্তু। রাস্তাগুলো যেমন বড় বড়, তেমনি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দু'পাশে বড়-বড় বাড়ি। দিল্লির নাম শুনলেই সন্তুর মনে পড়ে লালকেল্লা আর কুতুব মিনারের কথা। কিন্তু সে-দুটো দেখা যাচ্ছে না। তবে একটা প্রকাণ্ড, গোলমতন বাড়ি দেখে সন্তু চিনতে পারল। ছবিতে অনেকবার দেখেছে, ওটাই পার্লামেন্ট ভবন।

নরেন্দ্র ভার্মার গাড়ি এসে থামল একটা নার্সিং হোমের সামনে। তিনতলার একটা ক্যাবিনের দরজা খুলতেই কাকাবাবুর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

সন্তু দেখল, কাকাবাবুর পেট আর বাঁ হাত জড়িয়ে মস্ত বড় ব্যান্ডেজ। মুখে কিন্তু বেশ হাসিখুশি ভাব। ক্যাবিনটা বেশ বড়, হোটেলের সুইটের মতন। সামনের দিকে বসবার জায়গা, দুটি

সোফা ও দুটি চেয়ার রয়েছে, পেছন দিকে খাট আর একটা ছোট টেবিল। কাকাবাবু বসে আছেন একটা সোফায়, অন্যটিতে বসে আছেন একজন লম্বামতন লোক। সন্তু চিনতে পারল, এই লোকটিকেই কলকাতায় তাদের বাড়িতে কয়েকদিন আসতে দেখেছে। এঁরা দু'জনে মনোযোগ দিয়ে কী যেন আলোচনা করছিলেন। সন্তুদের দেখে থেমে গেলেন।

কাকাবাবু সন্তুকে ডেকে বললেন, "আয় সন্তু, কাল রাত্তিরে তোর একা থাকতে খারাপ লাগেনি তো ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দু'জন গার্ড পোস্টেড ছিল ওর ঘরের দিকে নজর রাখার জন্য, সন্তু তা টেরই পায়নি।"

সন্তু বেশ অবাক হল। সত্যি সে কিছু বুঝতে পারেনি তো !

কাকাবাবু বললেন, "আর কিছু হবে না। আমাকে কোনও উটকো ডাকাত মারতে এসেছিল বোঝা যাচ্ছে। এটা কোনও দলের কাজ নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উট্‌কো ? উট্‌কো কথাটার মানে কী আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই, সাধারণ একটা কেউ।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাকে গুলি করে পালাল, ঘর থেকে কিছু জিনিসপত্র নিল না, এ কি সাধারণ ডাকাত ?"

অপরিচিত লোকটি মাথা নিচু করে বসে ছিলেন। এবারে মুখ তুলে বললেন, "আই ফিল গিল্‌টি !"

কাকাবাবু ইংরিজিতে বললেন, "না, না, আপনার কোনও দায়িত্ব নেই। আমি তো নিজের ইচ্ছেতেই এসেছি !"

তারপর সন্তুদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন...এঁর নামটা মস্ত বড়, সবটা বললে মনে থাকবে না, সবাই এঁকে আল মামুন বলে ডাকে। ইনি

একজন ব্যবসায়ী।”

ভদ্রলোক সন্তুর দিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, “গুড মর্নিং, হাউ ডু ইউ ডু ?”

তারপরই হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “আই মাস্ট গো ! মিস্টার রায়চৌধুরী, আই উইল গেট ইন টাচ উইথ ইউ !”

বেশ তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন। স্পষ্ট মনে হল, ওঁর মুখে যেন একটা ভয়ের ছাপ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি করলেন, তারপর তিনিও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

কাকাবাবু বললেন, “সন্তু, তুই অমনভাবে তাকচ্ছিস কেন ? এই ব্যান্ডেজটা দেখতেই এত বড়, আসলে বিশেষ কিছু হয়নি। পাঁজরা ঘেঁষে একটা গুলি চলে গেছে, কিন্তু পাঁজরা-টাজরা ভাঙেনি কিছু। ব্যাটারা কেন যে এরকম এলোপাথারি গুলি চালায় ! টিপ করতেই শেখেনি !”

সন্তু একদৃষ্টিতে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। পেটে গুলি লেগেছে, তা নিয়েও কাকাবাবু ঠাট্টা ইয়ার্কি করতে পারেন !

নরেন্দ্র ভার্মা তক্ষুনি ফিরে এসে বললেন, “আমার লোক লাগিয়ে দিয়েছি, তোমার পাখি কোন্ বাসায় থাকে তা ঠিক জেনে আসবে।”

কাকাবাবু হাসলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এবারে সব খুলে বলো তো রাজা ! তুমি আমার ওপরেও ধোঁকা চালাচ্ছ ? আমাদের না জানিয়ে ও লোকটার সঙ্গে তোমার কিসের মামলা ?”

কাকাবাবু সে-রকমই হাসতে হাসতে বললেন, “আরে সেরকম কিছু না। এর মধ্যে কোনও ক্রাইম বা ষড়যন্ত্র বা বড় ধরনের রহস্যের ব্যাপার নেই। ওই লোকটা একটা অদ্ভুত কথা বলেছিল,

তাই আমি কৌতূহলী হয়ে এসেছি দিল্লিতে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলল, "ক্রাইম কিছু নেই? তবে গুলিটা চালাল কে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা অবশ্য আলাদা ব্যাপার। আমি যেজন্য দিল্লিতে এসেছি তার সঙ্গে এর হয়তো কোনও সম্পর্ক নেই। আবার থাকতেও পারে। আচ্ছা, আমি সব বুঝিয়ে বলছি, সুস্থির হয়ে বোসো।"

সন্তুর দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুই জানিস, হিয়েরোগ্লিফিকস কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ!"

কাকাবাবু আর নরেন্দ্র ভার্মা দু'জনেই অবাক হয়ে পরস্পরের দিকে তাকালেন।

কাকাবাবু বললেন, "অ্যাঁ? তুই জানিস? বল তো কাকে বলে?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স হচ্ছে একরকম ছবির ভাষা। মিশরের পিরামিডে কিংবা অন্য-সব স্মৃতিস্তম্ভে ছবি এঁকে এঁকে অনেক কথা লেখা হত!"

"অনেকটাই ঠিক বলেছিস। এ তুই কোথা থেকে শিখলি?"

"একটা কমিক্সে পড়েছি।"

"তা হলে তো কমিক্সগুলো যত খারাপ ভাবতুম তত খারাপ নয়!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি যে শব্দটা বললে, আমি নিজেই তো তার মানে জানতাম না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তুমিও কমিক্স পড়তে শুরু করে দাও! আচ্ছা, এবার তাহলে ঘটনাটা গোড়া থেকে বলি। এই যে আল মামুন নামে ভদ্রলোককে দেখলে, ইনি কলকাতায় গিয়ে

আমার সঙ্গে কয়েকবার দেখা করেছিলেন। একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চান। উনি কয়েকটা লম্বা-লম্বা হলদে কাগজ নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে লাল রঙের অনেক ছোট-ছোট ছবি আঁকা। দেখলে মনে হয়, যে এঁকেছে, তার আঁকার হাত খুবই কাঁচা, এবং সম্ভবত একজন বুড়ো লোক। আল মামুন বলেছেন, ওই ছবিগুলো এঁকেছেন তাঁর এক আত্মীয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই ছবিগুলো, ওই যে কী নাম বললে, সেই ভাষায় লেখা?"

সন্তু বলল, "হিয়েরোগ্লিফিক্স!"

কাকাবাবু হাহা করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই বললেন, "কয়েক হাজার বছর আগে লুপ্ত হয়ে গেছে এই ভাষা। এখন কি আর এই ভাষায় কেউ লেখে? লিখলেও বুঝতে হবে সে-লোকটি পাগল।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "ছবিগুলো তোমার কাছে নিয়ে যাবার মানে কী? তুমি কি ওই ভাষার একজন এক্সপার্ট?"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলতে পারো। এক সময় আমি ওই নিয়ে চর্চা করেছি। তোমার মনে নেই, নরেন্দ্র, বছর দশেক আগে আমি টানা ছ'মাস ইজিপ্টে ছিলাম? মিশরের সব হিয়েরোগ্লিফিক্সের পাঠ আজও উদ্ধার করা যায়নি। অনেকেই চেষ্টা করছেন। আমি কিছু-কিছু পড়তে পারি। এ সম্পর্কে আমার লেখা কয়েকটা প্রবন্ধও বিদেশি কাগজে বেরিয়েছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা জানতে চাইলেন, "ওই আল মামুন কোন্ দেশের লোক?

'ইজিপশিয়ান। ব্যবসা সূত্রে প্রায়ই আসতে হয় এদেশে। এখান থেকে উনি চা, সেলাইকল, সাইকেল, এইসব জিনিস নিয়ে যান নিজের দেশে।"

"তা একজন ব্যবসায়ীর এরকম ইতিহাসে উৎসাহ ?"

"সেটাও একটা মজার ব্যাপার। ওই ভদ্রলোক প্রাচীন মিশরের ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানেন না। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম ছবিগুলো বোধহয় ইজিপ্টের কোনও পিরামিডের দেওয়াল থেকে কপি করা। কিন্তু তা-ও নয়। আল মামুন কোনও দিন পিরামিড চোখেও দেখেনি !"

'অ্যাঁ ? ইজিপ্টের লোক অথচ পিরামিড দেখেনি !"

"এতে আশ্চর্য হবার কী আছে ? ভারতবর্ষের সব লোক কি তাজমহল দেখেছে ? হিমালয়ই বা দেখেছে ক'জন ? আল মামুন দূর থেকে হয়তো একটা দুটো পিরামিড দেখে থাকতে পারেন। কিন্তু ভেতরে কখনও যাননি। উনি বলছেন যে, এই দিল্লিতেই ওঁর এক আত্মীয় থাকেন, ছবিগুলো তিনি এঁকেছেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা বিরক্ত হয়ে বললেন, "ধেত্ ! কী তুমি সব ছবি-টবির কথা বলছ, কোন্ বুড়ো কী এঁকেছে, তাতে আমি কোনও আগ্রহ পাচ্ছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "সেইজন্যই তো তোমাকে আগে এসব বলতে চাইনি।"

"কিন্তু এর সঙ্গে তোমাকে মার্ডার করার সম্পর্ক কী ? মানে বলছি কী, তোমাকে হঠাৎ কেউ মারতে এল কেন ?"

"সম্পর্ক একটাই থাকতে পারে। আল মামুন ওই ছবিগুলোর অর্থ করে দেওয়ার জন্য আমাকে এক লক্ষ টাকা দিতে চেয়েছিলেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা হুই-ই করে শিস দিয়ে উঠে বললেন, "এক লাখ টাকা ? কয়েকটা ছবি পড়ে দেবার জন্য ? কী আছে ওই ছবির মধ্যে ? তুমি মানে বুঝেছিলে ?"

"আগে আর-একটা ব্যাপার শোনো। আল মামুনের ওই যে

আত্মীয়, তাঁর নাম মুফতি মহম্মদ। তিনি খুব ধার্মিক ব্যক্তি, তাঁর অনেক শিষ্য আছে। তাঁর বয়েস নাকি সাতানব্বই, শরীর বেশ শক্তসমর্থ। শুধু গত বছর থেকে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে গেছে। একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেন না। তাঁকে চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছে দিল্লিতে।"

"সাতানব্বই বছর বয়েস ? তাঁর আবার চিকিৎসা ?"

"এটা দেখা যায় যে, সন্ন্যাসী-ফকিররা অনেক দিন বাঁচেন। তাঁদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। সাধক মুফতি মহম্মদের শুধু কথা বন্ধ হয়ে গেছে।"

"সাতানব্বই বছর বয়সে তিনি ছবি আঁকছেন ?"

"আল মামুনের মুখে যা শুনেছি, উনি লিখতে জানেন না। আগে কখনও ছবিও আঁকেননি। মুসলমান সাধকেরা কেউ ছবি আঁকেন না। ইনি ছবি আঁকছেন ঘুমের ঘোরে।"

"অ্যাঁ ? গাঁজাখুরি গল্প শুরু করলে রাজা ?"

"আর-একটু ধৈর্য ধরে শোনো, নরেন্দ্র ! আমি যা শুনেছি, তা-ই বলছি। ধর্মীয় গুরু বলে মুফ্‌তি মহম্মদকে হাসপাতালে রাখা হয়নি, রাখা হয়েছে আলাদা একটা বাড়িতে। এক-একদিন মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে উঠে বসে ওই ছবিগুলো আঁকছেন।'

"হলদে কাগজে, লাল কালিতে ? ঘুমের মধ্যে তিনি সে-সব পেলেন কোথায় ?"

"লাল কালি নয়, লাল পেন্সিল। উনি যে ঘরে থাকেন, তার পাশের ঘরের টেবিলে অনেক রকম কাগজ আর পেন্সিল থাকে। সেটা আল মামুনের অফিস-ঘর। মুফ্‌তি মহম্মদ সাহেব ঘুমের মধ্যেই পাশের ঘরে উঠে এসে, বেছে বেছে হলদে কাগজ আর লাল পেন্সিলে ছবিগুলো আঁকছেন। ছবিগুলো যে হিয়েরোগ্লিফিক্‌সেরই মতন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিছু

কিছু পরিষ্কার অর্থ পাওয়া যায়।”

“কী মানে বুঝলে?”

“সেটা এখন বলা যাবে না। খুব গোপন ব্যাপার। সাধক মুফ্তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছেন। আল মামুন তাঁদের কিছু জানাতে চান না। গুরুদেব কী লিখছেন সেটা তিনি নিজে আগে জেনে নিতে চান।”

“সেইজন্য দিতে চান এক লাখ টাকা? উনি কি ভাবছেন, এটাই গুরুর বিষয়-সম্পত্তির উইল?”

“গুরুর উপদেশও অনেকের কাছে খুব মূল্যবান।”

“তুমি তবে এক লাখ টাকা পেয়ে গেছ, আর টাকার লোভেই দুশমন তোমাকে গুলি করতে এসেছিল?”

“সেই টাকা পাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। ওই কাগজে কী লেখা হয়েছে, তা আমি আল মামুনকে বলিনি এখনও!”

“বলোনি? ওকেও বলোনি কেন?”

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, “এক লাখ টাকা দিতে চায়, তবু ওকে তুমি দু'চারটা ছবির মানে বলে দাওনি?”

কাকাবাবু বললেন, “না। ওকে কিছু বলিনি, তার কারণ আমি আল মামুনের কোনও কথা বিশ্বাস করিনি।”

সন্তু এতক্ষণ প্রায় দম বন্ধ করে শুনছিল, এবারে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলল। টাকার লোভে কাকাবাবু কোনও কাজ করবেন, তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না।

কাকাবাবু আবার বললেন, “ওই ছবির ভাষা থেকে আমি যা বুঝেছি, তা এখনকার কোনও ব্যাপারই নয়। অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার একটা ঘটনার কথা বলা হচ্ছে। তাও শেষ হয়নি। আমি পেয়েছি মাত্র চারখানা হলদে কাগজ। এর পরে

যেন আরও আছে। সেইজন্য আমি আল মামুনকে বলেছিলুম আমি গুরু মুফ্‌তি মহম্মদকে নিজের চোখে দেখতে চাই। সেইজন্যই আমার দিল্লি আসা।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "দেখা হয়েছে?"

কাকাবাবু বললেন, "না। সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। এতদিন দিল্লি এসে বসে রইলুম, তবু আল মামুন সেই ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন না। কখনও বলেন যে, ওঁর গুরুর মেজাজ ভাল না থাকলে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতে চান না। আবার কখনও বলেন যে, অন্য শিষ্যরা সব সময় ঘিরে থাকে, সেইজন্য সুযোগ হচ্ছে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার ওই আল মামুন কোথায় থাকে আমি আজই জেনে যাচ্ছি। আমি ওকে ফলো করার জন্য লোক লাগিয়ে দিয়েছি। এবারে বলো, তোমার ওপর যে-লোকটা গুলি চালাতে এসেছিল, সে লোকটা কেমন? সেও কি পরদেশি? তার মুখ তুমি নজর করেছিলে?"

কাকাবাবু, বললেন, "হ্যাঁ, মুখ দেখেছি, কিন্তু একপাশ থেকে। আমার ধারণা সে একটা ভাড়াটে খুনি। কেউ তাকে টাকা দিয়ে বলেছে আমাকে সাবাড় করে দিতে। দ্যাখো, আমার ওপর অনেকের রাগ আছে। কত পুরনো শত্রু আছে। তাদেরই কেউ দিল্লিতে আমায় চিনতে পেরে খতম করে দিতে চেয়েছে। ও ঘটনায় গুরুত্ব দেবার কিছু নেই!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী বলছ, রাজা? একটা লোক তোমাকে খতম করে দিতে এসেছিল, আর তাতে কোনও গুরুত্ব নেই? তাজ্জব! লোকটা যদি আবার আসে? শুনেছ, সনটু, তোমার কাকাবাবু কেমুন ছেলেমানুষের মতন কথা বলেন!"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "আরে, ও সব নিয়ে মাথা

ঘামাতে গেলে তো কোনও কাজই করা যায় না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটা কি রাত্তিরবেলা ঘরের মধ্যে এসে গুলি করেছিল ?"

কাকাবাবু বললেন, "তখন রাত বেশি না, এগারোটা হবে বড়জোর। হোটেলের ঘরে বসে আমি পড়াশুনো করছিলাম। ঘরের পাশেই একটা ছোট বারান্দা, তার দরজাটা খোলা। একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে দেখি যে, বাইরে থেকে বারান্দায় একটা লোক লাফিয়ে উঠে এল। তার হাতে রিভলভার। আমারও বালিশের তলায় রিভলভার থাকে, তুই জানিস। কিন্তু আমি বসে ছিলাম, বালিশটা থেকে বেশ দূরে। হাত বাড়িয়ে সেটা নেবার সময় পেলাম না। লোকটা এসেই কোনওরকম কথাবার্তা না বলে রিভলভারটা তুলল আমার কপাল লক্ষ করে। যদি ঠিক টিপ করে গুলি চালাত, তা হলে আমি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যেতাম। তখন বাঁচার একটাই উপায়। আমি প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে বললুম, "ব্লাডি ফুল ! লুক বিহাইন্ড !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কপালের সামনে রিভলভারের নল দেখেও তুমি চিৎকার করতে পারলে ? তোমার নার্ভ আছে বটে !"

কাকাবাবু বললেন, "আমি আগেও অনেকবার এই রকম চেঁচিয়ে সুফল পেয়েছি। হঠাৎ খুব জোরে শব্দ হলে পাকা-পাকা শিকারিদেরও টিপ নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও তাই হল। আমার ধমক শুনে লোকটার হাত কেঁপে গেল একটু, তার গুলি লাগল আমার পাঁজরায়। আমি সাঙ্ঘাতিক আহত হবার ভান করে ঝাঁপিয়ে পড়লুম বিছানায়। সঙ্গে-সঙ্গে বালিশের তলা থেকে আমার রিভলভারটা বার করে এনেছি। লোকটাকে আমি তখন গুলি করতে পারতুম। কিন্তু আমি দেখতে চাইলুম লোকটা এর পর কী করে ! কোনও জিনিসপত্তর নিতে চায় কি না। লোকটা

কিন্তু আর কিছু করল না। সে ভাবল বোধহয় যে, একটা গুলি চালিয়েই তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আবার টপ করে বারান্দা ডিঙিয়ে পালিয়ে গেল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, ভাড়াটে খুনি বলেই মালুম হচ্ছে। দিল্লিতে এরকম অনেক আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সন্দেহ হচ্ছে, যে ওকে ভাড়া করেছিল, সে ওকে পুরো টাকা দেয়নি। এত কাঁচা কাজের জন্য ওর পাঁচ টাকার বেশি পাওয়া উচিত নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "লোকটা সাকসেসফুল হয়নি বলে তোমার আফসোস হচ্ছে মনে হচ্ছে!"

কাকাবাবু আবার জোরে হেসে উঠলেন। নরেন্দ্র ভার্মাও হাসতে লাগলেন।

এই সময় বাইরের রাস্তায় একটা হইচই আর দুম দাম শব্দ হতে লাগল। সন্তু চলে এল জানলার কাছে।

কী যেন একটা কাণ্ড হয়েছে রাস্তায়। লোকজন ছোটাছুটি করছে। একটা বাসে আগুন লেগে গেছে।

নরেন্দ্র ভার্মা উঠে এসে উঁকি দিয়ে বললেন, "ওঃ! এমন কিছু নয়। বাস বোধহয় একটা লোক চাপা দিয়েছে, তাই পাবলিক রেগে গিয়ে বাসটাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে! এ সব তোমাদের ক্যালকাটাতে আগে হত, এখন আমদানি হয়ে গেছে দিল্লিতেও!"
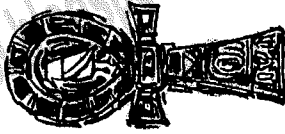
সেদিন দিল্লি শহরের অনেক রাস্তাতেই খুব গণ্ডগোল, মারামারি চলল। পরের দিন কারা যেন ডেকে বসল হরতাল। বাস, ট্যাক্সি, অটো রিকশা সব বন্ধ। সকালের দিকে কয়েকটা প্রাইভেট গাড়ি বেরুলেও লোকেরা বন্ধ করে দিল ইট-পাটকেল মেরে। দিল্লির চওড়া-চওড়া রাস্তাগুলো একেবারে ফাঁকা।

এত বড় একটা ব্যস্ত শহরকে দিনের বেলা একেবারে শুনশান দেখলে কেমন অদ্ভুত লাগে!

আগের রাত্তিরে সন্তু ফিরে এসেছিল গেস্ট হাউসে। সকাল থেকে সে ছটফট করছে। কী করে সেই নার্সিংহোমে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাবে? গাড়ি বন্ধ বলে নরেনকাকাও আসতে পারবেন না। সন্তু যে রাস্তা চেনে না। না হলে সন্তু হেঁটেই চলে যেতে পারত।

বেলা এগারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর সন্তু আর থাকতে পারল না, বেরিয়ে পড়ল। সন্তু জানে, হরতালের দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটলে কেউ কিছু বলে না। কয়েকটা সাইকেলও চলছে।

বেশিদূর যেতে হল না, একটু পরেই একটা পুলিশের গাড়ি এসে থামল সন্তুর পাশে। ড্রাইভারের পাশ থেকে নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "উঠে পড়ো সনটু! একলা কোথা যাচ্ছিলে?"

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল নার্সিং হোমে।

কাকাবাবু খুব উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলেন। ওদের দেখেই ব্যস্ত হয়ে বললেন, "এসেছ? আমি ভাবছিলাম যে কী করে আসবে!

শোনো নরেন্দ্র, রফি মার্গ কোথায় ? এখান থেকে হেঁটে যাওয়া যায় ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “রফি মার্গ ? সে তো এখান থেকে অনেক দূর। এটা চিত্তরঞ্জন পার্ক আর রফি মার্গ সেই কনট প্লেসের আছে। হেঁটে যাওয়া অসম্ভব !”

কাকাবাবু বললেন, “নেপোলিয়ন কী বলেছিলেন জানো না ? অসম্ভব বলে কিছু নেই তাঁর ডিক্‌শনারিতে।”

“সেটা নেপোলিয়নের বেলা সত্যি হতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে নয়। কী ব্যাপার, তুমি রফি মার্গ পর্যন্ত হেঁটে যেতে চাও নাকি ?”

“হ্যাঁ। আর দেরি করে লাভ নেই। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।”

কাকাবাবু উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন, নরেন্দ্র ভার্মা বাধা দিয়ে বললেন, “আরে, ঠারো, ঠারো ! হঠাৎ রফি মার্গ হেঁটে যেতে হবে কেন সেটা শুনি !”

কাকাবাবু বললেন, “আল মামুন ফোন করেছিল একটু আগে।”

“তোমার এ-ঘরে তো ফোন নেই ?”

“দোতলায় আছে। সেখানে নেমে গিয়ে আমি ফোন ধরেছি।”

“এখনও তোমার ব্যান্ডেজ বাঁধা, এই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যায় করেছ। যাই হোক, তারপর কী বলল, টেলিফোনে ?”

“গুরু মুফ্‌তি মহম্মদ আবার ঘোরের মাথায় ছবি আঁকতে শুরু করেছেন। আজ আর ওখানে কোনও লোকজন নেই। আমরা এখন গেলে দেখতে পারি।”

“এই যে শুনেছিলুম উনি মাঝরাতে ছবি আঁকেন ?”

"মাঝরাতেই যে আঁকবেন, তার কোনও মানে নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে আঁকতে শুরু করেন। শুনলুম যে, উনি কাল সারা রাত ঘুমোননি, বিছানার ওপর ঠায় বসেছিলেন, ঘুমিয়েছেন সকাল আটটায়। চলো, চলো, আর দেরি করে লাভ নেই।"

"শোনো রাজা, নেপোলিয়ান যাই-ই বলুন, তোমার পক্ষে এখন যাওয়া অসম্ভব। ডাক্তার তোমাকে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই বারণ করেছেন। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে অতদূর যেতে চাও ?"

"আরে ডাক্তারদের কথা সব সময় মানলে চলে না। আমি ভাল আছি বেশ। অনায়াসে যেতে পারব !"

"পাগলামি কোরো না, রাজা। আমাদের মতন লোকেরই হেঁটে যেতে তিন-চার ঘণ্টা লাগবে। আর তুমি ক্রাচ নিয়ে কতক্ষণে পৌঁছবে ? পুলিশের গাড়িটা ছেড়ে দিলাম...ঠিক আছে টেলিফোনে আর-একটা গাড়ি আনাচ্ছি, সেই গাড়িতে যাব।"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সে-কথা আগেই ভেবেছিলাম। আল মামুনকে আমি বলেছিলাম, আজ তো গাড়িঘোড়া চলছে না, যেতে গেলে পুলিশের সাহায্য নিতে হবে। আল মামুন তীব্র আপত্তি করে বলেছে, না, পুলিশের গাড়িতে যাওয়া কিছুতেই চলবে না। ও-বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থামলেই সকলের চোখে পড়ে যাবে। মুফ্‌তি মহম্মদের মতন সম্মানিত মানুষের কাছে পুলিশ এসেছে, এ-কথা জানলে তার শিষ্যরা চটে যাবে খুব !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তাও একটা কথা বটে। পরদেশি নাগরিক, ঝটাক্‌সে ওদের কাছে পুলিশের গাড়ি যাওয়া ঠিক নয়। তা হলে কী উপায় ?

"হেঁটেই যেতে হবে। শুধু-শুধু দেরি করছ কেন ?"

"রাজা, তুমি বুঝতে পারছ না, ক্র্যাচ দিয়ে হেঁটে পৌঁছতে

তোমার কম সে কম চার ঘণ্টা লেগে যাবে। ততক্ষণ কি তোমার ওই বুড়াবাবা বসে বসে ছবি আঁকবেন ?"

কাকাবাবু এবারে ব্যাপারটা বুঝলেন। মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। এ তো আর পাহাড়ে ওঠা নয়, শুধু-শুধু একটা শহরে চার-পাঁচ ঘণ্টা হাঁটার কোনও মানে হয় না!

একটু চুপ করে থেকে কাকাবাবু বললেন, "আর একটা উপায় আছে, কোনও ডাক্তারের গাড়ি যেতে পারে, তাই না ? ডাক্তারের গাড়ি কিংবা হাসপাতালের গাড়ি নিশ্চয়ই আটকাবে না ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হাঁ, তা হতে পারে। দেখি কোনও ডাক্তারের গাড়ি যোগাড় করা যায় কি না।"

সন্তু বলল, "সাইকেলেও যাওয়া যায়। আমি দেখলুম রাস্তায় সাইকেল চলছে।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছিস! তা হলে দেখলি তো সাইকেল শেখারও উপকারিতা আছে। এক-এক সময় কত কাজে লাগে। ডাক্তারের গাড়ি যদি যোগাড় করা না যায়, তাহলে তুই আর নরেন্দ্র সাইকেলে চলে যেতে পারবি। পায়ের জন্য আমি তো আজকাল আর সাইকেল চালাতে পারি না।"

নরেন্দ্র ভার্মা নীচ থেকে ঘুরে এসে বললেন, "এখন তো একটাও ডাক্তারের গাড়ি নেই। তবে একটা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যান একটু বাদেই ফিরবে।"

কাকাবাবু অস্থিরভাবে বললেন, "একটু বাদে মানে কতক্ষণ বাদে ? দ্যাখো, না হয় দুটো সাইকেলই যোগাড় করো।"

শেষ পর্যন্ত তাই-ই করতে হল। নানান জায়গায় টেলিফোন করেও কোনও ডাক্তারের গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া গেল না। সবাই বলেছে, আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে আসতে পারে। কাকাবাবু অত দেরি করতে রাজি নন। নার্সিং হোমের

দারোয়ানদের কাছ থেকে দুটো সাইকেল যোগাড় হল, তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা।

এ রকম ফাঁকা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে আরাম। হরতালের দিন কলকাতার রাস্তায় ছেলেরা ফুটবল খেলে কিন্তু দিল্লিতে সে-রকম কিছু দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় মানুষজন খুব কম।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সেই কলেজ-জীবনের পর আর

সাইকেল চালাইনি। তোমার কাকাবাবুর পাল্লায় পড়ে কত কী যে করতে হয় আমাকে! অবশ্য, খারাপ লাগছে না। আচ্ছা সন্টু, একটা সত্যি কথা বলবে?"

"হ্যাঁ, বলুন।"

"একটা বুড়া সাধু কী সব ছবি আঁকছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাবার কি কোনও মানে আছে? আমরা কি বুনো হাঁস তাড়া করছি না?"

"সব ব্যাপারটা আমি এখনও বুঝতে পারছি না, নরেনকাকা !"

"চলো, গিয়ে দেখা যাক !"

সাইকেলে রফি মার্গ পৌঁছতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। নরেন্দ্র ভার্মা দিল্লির সব রাস্তা খুব ভাল চেনেন, তাই ঠিকানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না।

এই রাস্তার সব বাড়িই অফিসবাড়ি বলে মনে হয়। তারই মধ্যে একটি ছোট, হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। ছোট হলেও বাড়িটি দেখতে খুব সুন্দর, সামনে, অনেকখানি ফুলের বাগান।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, কিন্তু এ-বাড়িতে যে ইজিপশিয়ানরা থাকে, কোনও দিন জানতেই পারিনি। দিল্লিতে যে কত কিসিমের মানুষ থাকে !"

গেটের সামনে একজন দরোয়ান বসে আছে। তার কাছে আল মামুনের নাম করতেই সে দোতলায় উঠে যেতে বলল।

সারা বাড়িটা একেবারে নিস্তব্ধ, কোনও মানুষ আছে বলে মনেই হয় না। দোতলাতেও সিঁড়ির মুখে কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট। ওরা সেখানে এসে দাঁড়াতেই আল মামুন একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের কোনও রকম শব্দ করতে নিষেধ করলেন। তারপর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, "হোয়ার ইজ মিঃ রায়চৌধুরী ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "গাড়ি যোগাড় করা যায়নি বলে তিনি আসতে পারেননি !"

আল মামুনের মুখে একটা হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "আপনাদের তো ডাকিনি। আপনাদের দিয়ে কোনও কাজ হবে না। আপনারা ফিরে যান।"

এই কথা বলে আল মামুন পেছন ফিরতেই নরেন্দ্র ভার্মা গেটের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আল মামুনের একটা হাত চেপে ধরলেন।

তারপর খুব আস্তে অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, "আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। মিঃ রায়চৌধুরী আমাকে আর তাঁর ভাইপোকে পাঠিয়েছেন এখানে কী ঘটছে, তা দেখে গিয়ে রিপোর্ট করবার জন্য। এই হরতালের দিনেও আমরা কষ্ট করে এমনি-এমনি ফিরে যাবার জন্য আসিনি। গেট খুলুন।"

নরেন্দ্র ভার্মা এমনিতে হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু এক-এক সময় তাঁর মুখখানা এমন কঠিন হয়ে যায় যে, দেখলে ভয় লাগে।

আল মামুন আর দ্বিরুক্তি না করে গেট খুলে দিলেন। তারপর বললেন, "জুতো খুলে ফেলুন!"

খালি পায়ে একটা টানা বারান্দা পেরিয়ে এসে ওরা ঢুকল একটা মাঝারি সাইজের ঘরে। সে-ঘরে খাট-বিছানা পাতা, কিন্তু বিছানাতে কেউ নেই। বিছানার ঠিক পাশেই অন্য একটা ঘরে যাওয়ার দরজা।

আল মামুন ওদের ইশারা করলেন সেই দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে।

অন্য ঘরটিতে রয়েছে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার। একটা চেয়ারে বসে আছেন একজন খুবই লম্বা মানুষ, পরনে একটা-কালো রঙের আলখাল্লা। তাঁর মাথার চুল ধপধপে সাদা উলের মতন, আর মুখভর্তি সাদা দাড়ি পাতলা তুলোর মতন। হাতে একটা লাল ফেল্ট পেন, টেবিলের ওপর একটা বড় হলদে কাগজে তিনি ছবি আঁকছেন।

সত্যি, দেখলে মনে হয় যেন তিনি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আঁকছেন। চোখ দুটি প্রায় বোজা, হাতের কলমটা দিয়ে একটা দাগ কেটে থেমে যাচ্ছেন, তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার একটা দাগ কাটছেন।

সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা প্রায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

দেখতে লাগল এই দৃশ্য। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধ চেয়ারে সোজা হয়ে বসে ছবি আঁকছেন, এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না।

মুফতি মহম্মদ একবার হঠাৎ এই দরজার দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ দুটি খোলা, তবু তিনি ওদের দেখতে পেলেন কি না বোঝা গেল না। একটুও বিরক্ত হলেন না। বরং তাঁর মুখে যেন একটা পবিত্র ভাব ফুটে আছে। দেখলেই ভক্তি জাগে।

আবার মুখ ফিরিয়ে তিনি ছবি আঁকাতে মন দিলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা সন্তুকে চোখের ইঙ্গিতে বললেন, "এবার চলো!"

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে খানিকটা আসতেই সিঁড়িতে ঠং ঠং শব্দ উঠল।

আল মামুন ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন। সিঁড়ির মুখের কোলাপ্‌সিব্‌ল গেট তিনি ভুল করে খোলা রেখে এসেছিলেন। তিনি গেট পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই ভেতরে ঢুকে এলেন ক্রাচ বগলে নিয়ে একজন মানুষ।

নরেন্দ্র ভার্মা কাঁধ ঝাকিয়ে বললেন, "আনডন্‌টেড রাজা রায়চৌধুরী! তাকে কেউ পেছনে ফেলে রেখে আসতে পারে না!"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন, "তোমরা চলে আসার পরেই একটা অ্যামবুলেন্স পেয়ে গেলাম।"

তারপর তিনি আল মামুনকে জিজ্ঞেস করলেন, "খবর কী? এখনও ছবি আঁকছেন?"

ওরা তিনজনই এক সঙ্গে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "চলো। আমি একটু দেখি। ওঁর সঙ্গে আমার কথা বলা খুব দরকার।"

আল মামুন সজোরে মাথা নেড়ে বললেন, "নো নো নো, দ্যাট ইজ আউট অব কোয়েশ্চেন। ওঁকে এই অবস্থায় কিছুতেই ডিসটার্ব

করা যাবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কথা বলাটা অত্যন্ত জরুরি। আপনারা বুঝতে পারছেন না, কারও সঙ্গে কথা বলার জন্যই উনি ওই ছবিগুলো আঁকছেন?"

আল মামুন বললেন, "কী করে কথা বলবেন আপনি? ওঁর গলার আওয়াজ নষ্ট হয়ে গেছে, উনি কোনও উত্তর দিতে পারবেন না। আপনার ইংরিজি প্রশ্নও উনি বুঝবেন না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমিও সেই কথা ভাবছিলুম। রাজা, উনি তোমার প্রশ্ন বুঝবেন কী করে? আল মামুন যদি বুঝিয়েও দেন, তা হলেই বা উনি কী করে উত্তর দেবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "উনি যে ভাষা বোঝেন, সেই ভাষাতেই আমি প্রশ্ন করব।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু একটা ভাঁজ-করা কাগজ বার করলেন। তারপর দেখালেন সেটা খুলে। তাতেও কতকগুলো ছোট-ছোট ছবি আঁকা।

কাকাবাবু বললেন, "এই ছবির ভাষা তোমরা কেউ বুঝবে না, উনি হয়তো বুঝতে পারেন।"

কাকাবাবুকে নিয়ে আসা হল সেই ঘরে। সন্তু আর নরেন্দ্র ভার্মা দাঁড়িয়ে রইলেন দরজার কাছে। আল মামুন কাকাবাবুকে নিয়ে ঢুকলেন পাশে ঘরে।

কাকাবাবুর ক্রাচের শব্দ পেয়ে চোখ তুলে তাকালেন মুফ্‌তি মহম্মদ। আল মামুন খুব বিনীত ভাবে কিছু বললেন তাঁকে। খুব সম্ভবত কাকাবাবুর পরিচয় দিলেন।

কাকাবাবু কপালের কাছে হাত ছুঁইয়ে বললেন, "সালাম আলেকুম।"

তারপর তাঁর ছবি-আঁকা কাগজটা ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের

ওপর।

মুফ্‌তি মহম্মদ এখন নিশ্চয়ই জেগে উঠেছেন পুরোপুরি। কেননা, সেই কাগজটা দেখেই তাঁর মুখে দারুণ অবাক ভাব ফুটে উঠল। একবার কাগজটার দিকে, আর একবার কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন তিনি।

তারপর হাতছানি দিয়ে কাকাবাবুকে কাছে ডাকলেন। কাকাবাবু তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি তাঁর লম্বা ডান হাত রাখলেন কাকাবাবুর মাথায়, নিজে চোখ বুজে রইলেন একটুক্ষণ। ঠিক যেন তিনি কাকাবাবুকে আশীর্বাদ করছেন ভারতীয়দের প্রথায়।

একটু পরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে লাল কলমটা তুলে ছবি আঁকতে শুরু করলেন।

কিন্তু তাঁর হাত যেন চলছেই না। খুব অলস ভাবে দাগ কাটছেন, বোঝা যায় তাঁর হাত কেঁপে যাচ্ছে। একটুখানি এঁকেই তিনি তাকাচ্ছেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু ঘাড় নাড়ছেন।

মাত্র তিনটি ছবি কোনওক্রমে আঁকার পরেই তাঁর হাত থেকে কলমটা খসে পড়ে গেল মাটিতে। মুখখানা ঝুঁকে পড়ল বুকের ওপর, তারপর একেবারে নুয়ে টেবিলের ওপর পড়ে যাবার আগেই কাকাবাবু আর আল মামুন দু'দিক থেকে ধরে ফেললেন তাঁকে।

কাকাবাবু আর সন্তুকে কড়া পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে একটা সরকারি গেস্ট হাউসে। এর মধ্যে দু'বার হামলা হয়ে গেছে

কাকাবাবুর ওপর। কাকাবাবুর বন্ধুরা সবাই বলছেন ওঁকে কলকাতায় ফিরে যেতে। এখানে থাকলে ওঁর জীবন বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কাকাবাবু সে-কথা কিছুতেই শুনবেন না।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদ সেদিন সেই চেয়ারে বসেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষ সময়ে তাঁর মুখে কোনও যন্ত্রণার ছাপ ছিল না, বরং ফুটে উঠেছিল অপূর্ব সুন্দর হাসি। যেন তিনি খুব তৃপ্তির সঙ্গে এই জীবন শেষ করে চলে গেলেন।

সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের অনেক শিষ্য এই দিল্লিতেই আছে। এই শিষ্যদের আবার দুটি দল। এক দলের নেতা আল মামুন, আর অন্য দলটির নেতা হানি আলকাদি নামে একজন। শিষ্যদের ধারণা, সাধক মুফ্‌তি মহম্মদের কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি তাঁর শেষ উইল ছবি দিয়ে লিখে গেছেন। শুধু রাজা রায়চৌধুরীই সেই ছবির মানে জেনেছে। রাজা রায়চৌধুরী বাইরের লোক, সে কেন এই গোপন কথা জানবে? আল মামুন কেন রাজা রায়চৌধুরীকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল? দ্বিতীয় দলের নেতা হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নিজে নেতা হবার মতলবে সেই উইলের কথা অন্য কাউকে জানতে দিচ্ছে না।

কিন্তু মজা হচ্ছে এই, আল মামুনও রেগে গেছে কাকাবাবুর ওপর। বৃদ্ধ মুফতি মহম্মদের আঁকা ওই ছবিগুলোর যে কী মানে, তা কাকাবাবু আল মানমুনকেও বলেননি।

এমন কী, নরেন্দ্র ভার্মা বারবার জিজ্ঞেস করলেও কাকাবাবু মুচকি হেসে বলেছেন, "ধরে নাও, ওই ছবিগুলোর কোনও মানে নেই। আমি অবশ্য একরকম মানে করেছি, সেটা ভুলও হতে পারে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তুমি কী মানে বুঝেছ, সেটাই শুনি!"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটাও বলা যাবে না! মুফতি মহম্মদ

নিষেধ করে গেছেন।"

"অ্যাঁ! উনি কখন নিষেধ করলেন তোমায়? আমরা তো কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলুম!"

"কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি সব বোঝা যায়? দেখলে না, আমি মুফ্‌তি মহম্মদকে লিখে কিছু প্রশ্ন জানালুম। উনিও ছবি এঁকে তার উত্তর দিলেন।"

"তুমি কী প্রশ্ন করেছিলে?"

"আমি একটা মানে উল্লেখ করে জানতে চেয়েছিলুম, আপনি কি এটাই বোঝাতে চাইছেন? উনি তার উত্তরে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই লিখলেন না। উনি লিখলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, তার আগে কাউকে কিছু বোলো না।"

"যাচাই করে দেখো, মানে? অন্য কোনও পণ্ডিতের পরামর্শ নেবে? না, তাও তো পারবে না। অন্য কাউকে বলাই তো নিষেধ।"

"এটা যাচাই করার জন্য আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। ইজিপ্টে!"

সন্তু বলে উঠল, "পিরামিডের দেশে?"

কাকাবাবু চোখ দিয়ে হেসে বললেন, "মনে হচ্ছে তোর এবারে বিদেশ ঘোরা হয়ে যাবে, সন্তু!"

সন্তুর মনে পড়ে গেল রিনির কথা। সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে রিনি কায়রো বেড়াতে গেছে। তখন সে-কথা শুনে সন্তুর হিংসে হয়েছিল। এবারে সে-ই কায়রোতে পৌঁছে রিনিদের চমকে দেবে। কাকাবাবু এইজন্যই পাসপোর্ট আনতে বলেছিলেন?

নরেন্দ্র ভার্মা চিন্তিত ভাবে বললেন, "রাজা, এখন ইজিপ্টে গেলে তুমি যে একেবারে বাঘের মুখে গিয়ে পড়বে! এখানেই তুমি দু'তিনবার বিপদে পড়েছিলে। দিল্লিতে যে এত ইজিপশিয়ান থাকে

জানা ছিল না। ওখান থেকে আমাদের দেশে অনেকে পড়া-লিখা করতে আসে। বিজ্‌নেসের জন্যও আসে। আমি খবর নিয়ে জেনেছি ওই যে হানি আলকাদি নামের লোকটা, ওর অনেক গোঁড়া সাপোর্টার আছে। ওর পার্টি একবার একটা প্লেন হাইজ্যাক করেছিল। মুফতি মহম্মদের সিক্রেট তুমি যদি আগে ওদের কাছে ফাঁস না করো, তা হলে ওরা তোমাকে ছাড়বে না!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঘের মুখে গিয়ে পড়তেই তো আমার ইচ্ছে করে। তুমি কি ভাবছ, পুলিশ-পাহারায় আমি এখানে বসে থাকব?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্ট তোমাকে এখন ইজিপ্ট পাঠাতে রাজি হবে না। ও দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের বেশ ভাল সম্পর্ক আছে, তুমি গিয়ে যদি এখন একটা গণ্ডগোল পাকাও..."

কাকাবাবু তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "কিছু গণ্ডগোল পাকাব না। আমাকে গভর্নমেন্টেরও পাঠাবার দরকার নেই। আমি নিজেই যাব। তুমি বরং একটু সাহায্য করো, নরেন্দ্র। আজকের মধ্যেই আমাদের দু'জনের ভিসা যোগাড় করে দাও।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি এখনও বলছি, তোমার ওখানে যাওয়া উচিত নয়।"

কাকাবাবু এবারে হেসে ফেলে বললেন, "তোমার হিংসে হচ্ছে বুঝি, নরেন্দ্র? আমরা বেশ ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছি, তোমার যাওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি না!"

"মজা? তুমি ইজিপ্টে মজা করতে যাচ্ছ? হানি আলকাদিকে আমি যতটা চিনেছি, সে একটা দুর্দান্ত টাইপের লোক!"

"আরে, দুর্দান্ত প্রকৃতির লোকদের খুব সহজে বাগ মানানো যায়। যাদের বাইরে থেকে নরম-সরম মনে হয়, তাদেরই মনের

আসল চেহারাটা বোঝা শক্ত। দেখো না ওখানে কত মজা হয়। ফিরে এসে তোমাকে সব গল্প শোনাব।"

কাকাবাবু উঠে গিয়ে তাঁর হাতব্যাগ খুলে রিভলভারটা বার করলেন। সেটা নরেন্দ্র ভার্মার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা তোমার কাছে জমা রইল। বিদেশে যাচ্ছি, সঙ্গে আর্মস নিয়ে যাওয়া ঠিক নয়।"

নরেন্দ্র ভার্মা চোখ কপালে তুলে বললেন, "হানি আলকাদির দলবল তোমার ওপর সাঙ্ঘাতিক রেগে আছে জেনেও তুমি কোনও হাতিয়ার ছাড়া অত দূরের দেশে যাবে?"

কাকাবাবু নিজের মাথায় আঙুল দিয়ে টোকা মারতে মারতে ইয়ার্কির সুরে বললেন, "কাঁধের ওপর যে এই জিনিসটা রয়েছে, তার থেকে আর কোনও অস্ত্র কি বড় হতে পারে?"

নরেন্দ্র ভার্মা এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যেন তিনি বলতে চান, আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!

সন্ধেবেলা নরেন্দ্র ভার্মা চলে যাবার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "শোন্, এখানে খুব সাবধানে থাকবি। একা বাইরে বেরুবি না। ওরা যদি তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোথাও আটকে রাখে, তা হলে আমার ওপর চাপ দেওয়া সহজ হবে।"

সন্তু মুখে 'আচ্ছা' বললেও তলার ঠোঁটটা এমন ভাবে কাঁপাল যাতে বেশ একটু গর্ব-গর্ব ভাব ফুটে উঠল।

সেটা লক্ষ করে কাকাবাবু বললেন, "বুঝেছি, তুই মনে মনে ভাবছিস তো, তোকে কে আটকে রাখবে! তুই ঠিক পালাতে পারবি, তাই না? তাতেই তো আমার বেশি চিন্তা। তোর মতন বয়েসি একটা ছেলেকে কেউ সহজে মারে না, কিন্তু তুই পালাবার চেষ্টা করলে নির্ঘাত গুলিটুলি ছুঁড়বে। এর আগে তুই যতবার পালাবার চেষ্টা করেছিস, ততবার বেশি বিপদে পড়েছিস, মনে

নেই ?”

সন্তু বলল, “প্রত্যেকবার নয়। সেবারে ত্রিপুরায় যে আমি পালিয়েছিলুম, আর আমায় কেউ ধরতে পারেনি !”

কাকাবাবু বললেন, “আচ্ছা ঠিক আছে। মানলুম। কিন্তু এবারে দিল্লিতে আর কায়রোতে গিয়ে সব সময় আমার সঙ্গে থাকবি। একা-একা গোয়েন্দাগিরি করবার চেষ্টা করবি না।”

সন্তুর মনে পড়ল, সে একা তিলজলায় রহস্যসন্ধান করতে গিয়ে কী কেলেঙ্কারিই না হয়েছিল। ভাগ্যিস কাকাবাবু সে-কথা জানেন না।

অবশ্য সন্তু তখনই ঠিক করল, তা বলে সে দমে যাবে না। ভবিষ্যতে আবার সে ওই রকম চেষ্টা করবে। সে একা-একা একটা রহস্যের সমাধান করে কাকাবাবুকে তাক্ লাগিয়ে দেবে।

পরদিন কাকাবাবু টেলিফোনেই অনেক কাজ সেরে ফেললেন। তার পরের দিনই তাদের ইজিপ্ট যাত্রা। নরেন্দ্র ভার্মা গোমড়া মুখে ওদের পৌঁছে দিতে এলেন এয়ারপোর্টে। ওরা ভেতরে ঢোকার আগের মুহূর্তে নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “কী রাজা, এখনও কি মনে হচ্ছে তোমরা ওখানে মজা করতে যাচ্ছ ?”

কাকাবাবু চোখ টিপে বললেন, “হ্যাঁ, দারুণ মজা হবে। ইশ, তুমি যেতে পারলে না !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “আমি খোঁজ পেয়েছি হানি আলকাদিও আজ সকালে অন্য একটা প্লেনে ইজিপ্ট চলে গেছে। নিশ্চয়ই এমব্যাসি থেকে খবর পেয়েছে যে, তুমি ইজিপ্টের ভিসা নিয়েছ !”

কাকাবাবু সে খবর শুনে একটুও বিচলিত না হয়ে বললেন, “তা তো যাবেই। নইলে মজা জমবে কেন ? আল মামুন যায়নি ? সে তো রাগ করে আমার সঙ্গে আর দেখাই করে না !”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তার খবর জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "যাবে, সেও নিশ্চয়ই যাবে। আচ্ছা নরেন্দ্র, ফিরে এসে সব গল্প হবে।"

এই তো ক'দিন আগেই সন্তু প্লেনে চেপে কলকাতা থেকে এসেছে দিল্লিতে। সেই প্লেনটা ছিল এয়ারবাস আর এটা বোয়িং। একটা শিহরন জাগছে সন্তুর বুকের মধ্যে। বিদেশ, বিদেশ! পিরামিডের দেশ। ক্লিওপেট্রার দেশ।

প্লেন আকাশে ওড়বার পরেই সন্তু সিটবেল্ট খুলে উঠে দাঁড়াল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় যাচ্ছিস?"

সন্তু মুখ খুলে কিছু বলার আগেই কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাথরুমে যাবার কথা বলবি তো? শুধু-শুধু মিথ্যে কথা বলতে হবে না। পুরো প্লেনটা ঘুরে দেখার ইচ্ছে হয়েছে দেখে আয়। চলন্ত প্লেনে তো আর তোকে কেউ কিডন্যাপ করবে না! এক যদি প্লেনটা কেউ হাইজ্যাক করে! তা যদি করেই, তা হলে আর কী করা যাবে!"

সন্তুর আসল উদ্দেশ্য হল যাত্রীদের মুখগুলো ভাল করে দেখা। চেনা কেউ আছে কি না। তার দৃঢ় বিশ্বাস, আল মামুনও এই প্লেনে রয়েছে। প্রথম থেকেই ওই লোকটিকে সন্তু ঠিক পছন্দ করতে পারেনি। লোকটির সব সময় কী রকম যেন গোপন-গোপন ভাব। মনের কথা খুলে বলে না। আল মামুন প্রথমেই কাকাবাবুকে এক লক্ষ টাকার লোভ দেখিয়েছিল।

মুফতি মহম্মদ মরে যাবার পর আল মামুন খুব একটা দুঃখ পেয়েছেন এমন মনে হয়নি। তিনি কাকাবাবুকে বলেছিলেন যে, কাকাবাবু যদি সব ছবিগুলোর ভাষা শুধু আল মামুনকেই জানিয়ে দেন, তা হলে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন।
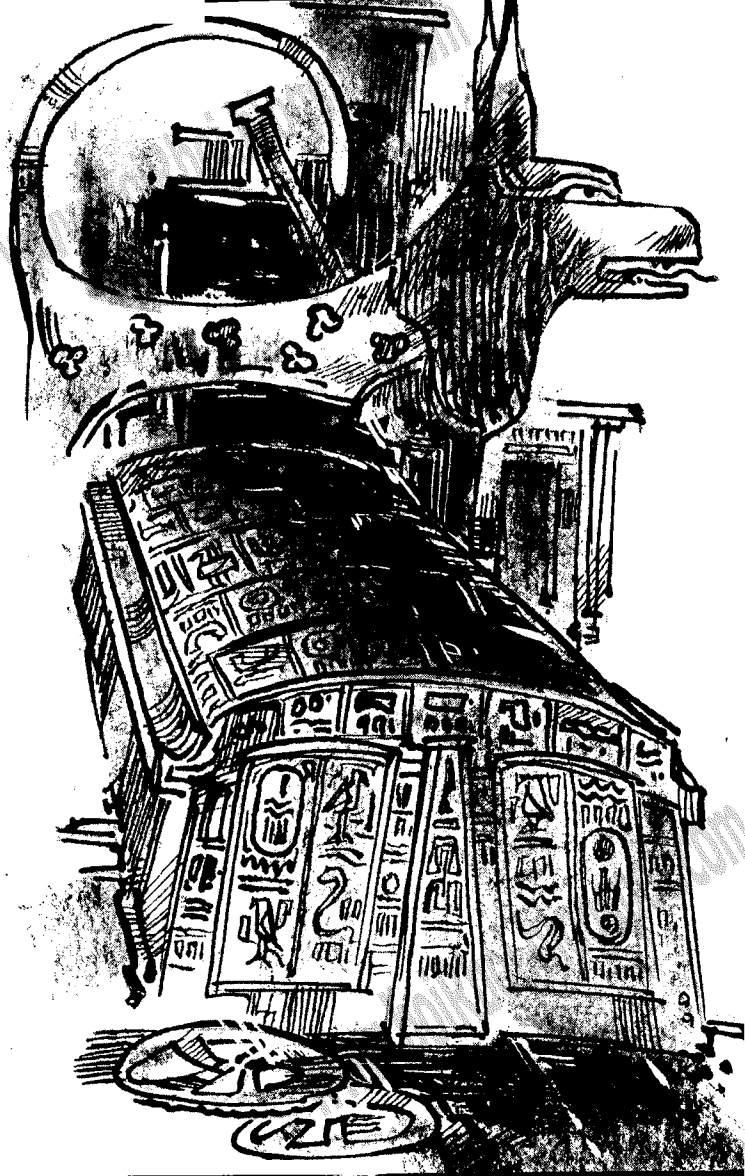
কাকাবাবু হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "তা কী করে হবে? আপনার গুরুই যে বলতে বারণ করেছেন!"

না, প্লেনের যাত্রীদের মধ্যে একজনও চেনা মানুষ দেখতে পেল না সন্তু। কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী রয়েছে, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় কথা বলছে না।

তখনও সন্তু জানে না যে, তার জন্য একটা দারুণ বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

খাবার দিচ্ছে দেখে সন্তু ফিরে এল নিজের জায়গায়। টেবিলটা খুলে পেতে নিল।

খেতে খেতে কাকাবাবু বললেন, "তুই হিয়েরোগ্লিফিক্‌সের মানে বলে আমায় চমকে দিয়েছিলি। পিরামিডগুলো কেন তৈরি হয়েছিল তাও তুই জানিস নিশ্চয়ই?"

সন্তু বলল, "রাজা-রানিদের সমাধি দেবার জন্য। ভেতরে অনেক জিনিসপত্তর রাখা থাকত, রাজা-রানিরা ভাবতেন যে, তাঁরা আবার বেঁচে উঠবেন!"

"সবচেয়ে পুরনো পিরামিড কতদিন আগে তৈরি হয়েছে বল তো?"

"সাড়ে পাঁচ হাজার বছর আগে!"

"এটা আন্দাজে বললি, তাই না?"

ধরা পড়ে গিয়ে সন্তু লাজুক ভাবে হাসল।

কাকাবাবু বললেন, "খুব পুরনো পিরামিডগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২৬৮৬ থেকে ২১৬০ বছরের মধ্যে তৈরি হয়েছিল। তা হলে বলা যেতে পারে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার বছর আগে। যাই হোক, পিরামিড তো অনেকগুলোই আছে। এর মধ্যে গিজার পিরামিড খুব বিখ্যাত। আর একটা আছে খুফু। এটা বিরাট লম্বা। এখন তো পৃথিবীতে মস্ত-মস্ত বাড়ি তৈরি হয়েছে। এক সময় নিউ

ইয়র্কের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং ছিল সবচেয়ে বড় বাড়ি, তারপর...”

“এখন শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার সবচেয়ে বড় !”

“হুঁ, তাও জানিস দেখছি। কিন্তু ওই খুফুর পিরামিড এখনও ওই সব বড়-বড় বাড়ির সঙ্গে উচ্চতায় পাল্লা দিতে পারে। এবারে তোকে একটা ভূতের গল্প বলি শোন্! পিরামিডগুলোর আশেপাশে আরও অনেক গোপন সমাধিস্থান আছে মাটির নীচে। বাইরের থেকে সেগুলো বোঝাই যায় না। সাহেবরা একটা-একটা করে সেগুলো আবিষ্কার করেছে। সম্রাট খুফুর মায়ের নাম ছিল হেটেকেরিস। তাঁর সমাধিস্থানের কথা অনেকে জানতই না। একজন সাহেব সেটি আবিষ্কার করেন। সেখানে কোনও পিরামিড নেই, মাটির অনেক নীচে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে ছিল সেই সমাধি। মমিগুলো যে কফিনের মধ্যে রাখে, তাকে বলে সারকোফেগাস। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে নামলেন, তিনি সেখানে অনেক কিছু দেখতে পেলেও সারকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেকেরিসের মমি দেখতে পেলেন না।”

“কেউ মমিটা চুরি করে নিয়ে গেছে !”

“হ্যাঁ পিরামিড থেকে অনেক মমি চুরি গেছে বটে, কিন্তু রানি হেটেকেরিসের সমাধিস্থানে তো কেউ আগে ঢোকেনি। তাছাড়া, রাজা-রানিদের সমাধিস্থানে অনেক দামি দামি জিনিস থাকত। যেমন সোনার খাট, সোনার জুতো, মণিমুক্তো-বসানো পানপাত্র, আরও অনেক কিছু। প্রথম যিনি সেই সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন, সেই চার্লস ব্রকওয়ে অনেক মূল্যবান জিনিস দেখতে পেয়েছিলেন, শুধু মমিটাই ছিল না। চোরেরা আর-কিছু নিল না, শুধু মমিটাই নিল ? চোরেরা তো মমি নেয় বিক্রি করবার জন্যই !”

“তারপর ?”

"এর এক বছর তিন মাস বাদে একদল পুরাতত্ত্ববিদ আবার ওই সুড়ঙ্গে নামেন। তাঁরা কিন্তু সরকোফেগাসের মধ্যে রানি হেটেফেরিসের মমি দেখতে পান। তাঁরা সেই মমির ছবিও তুলেছিলেন। মিশর সরকারের অনুমতি ছাড়া মমি সরানো যায় না। তাই তাঁরা সেদিন আর কিছু করেননি। ওপরে পাহারা বসিয়ে রেখেছিলেন। পরদিন আবার সেখানে গিয়ে দেখা গেল সারকোফেগাসের মধ্যে মমি নেই! আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে। তাই নিয়ে সে-সময় অনেক হইচই হয়েছিল, পৃথিবীর বহু কাগজে খবরটা ছাপা হয়েছিল, এই নিয়ে বইও লেখা হয়েছে। চার্লস ব্রকওয়ে অবশ্য দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলটির বক্তব্য একটুও বিশ্বাস করেননি।"

আরও কিছু শোনবার জন্য সন্তু কাকাবাবুর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে দেখে কাকাবাবু বললেন, "তোকে এমনি একটা রহস্যকাহিনী শোনালুম। আমরা যে কাজে যাচ্ছি তার সঙ্গে রানি হেটেফেরিসের সমাধির খুব একটা সম্পর্ক নেই।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। এঁটো প্লেট সরিয়ে নিয়ে গেল এয়ার-হস্টেসরা। তার একটু পরে একজন এয়ার-হস্টেস সন্তুর কাছে এসে ইংরিজিতে বলল, "তোমার নাম তো সন্তু, তাই না? প্লিজ কাম উইথ মি! তোমাকে আর-একবার সিকিউরিটি চেক করা হবে।"

সন্তু দারুণ অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। এয়ার-হস্টেসটি কাকাবাবুকে বলল, "আই অ্যাম সরি স্যার, এই ছেলেটি সন্দেহজনকভাবে সারা প্লেন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেইজন্য ক্যাপ্টেন বললেন, ওকে একবার সার্চ করে দেখতে হবে! আমি ওকে একটু নিয়ে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু বললেন "গো অ্যাহেড!"

সন্তু একই সঙ্গে আশ্চর্য হল, রেগে গেল, আবার বেশ মজাও পেল। এরা তাকে হাইজ্যাকার ভাবে নাকি ? সঙ্গে একটা খেলনা পিস্তল থাকলেও এদের বেশ ভয় দেখানো যেত।

এয়ার-হস্টেসটি সন্তুকে নিয়ে এল ককপিটে। সেখানকার দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা মাত্র একজন বলে উঠল, "হ্যান্ডস আপ !"

তারপরই হেসে উঠল হোহো করে !

সন্তুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, "বিমানদা !"

সন্তুদের পাড়ার যে বিমান পাইলট, সে-ই এই প্লেনের ক্যাপটেন। এরকম যোগাযোগ যে ঘটতে পারে, তা সন্তুর একবারও মনে হয়নি।

এয়ার-হস্টেস আর কো-পাইলটরা হাসছে সন্তুর ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা দেখে। এয়ার-হস্টেসটি বলল, "আমি যখন গিয়ে বললুম যে, ওকে সার্চ করা হবে, তখন এই ইয়াং জেন্টলম্যানটির মুখ একেবারে ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল। পকেটে সত্যিই বোমা-পিস্তল কিছু আছে নাকি ?"

বিমান অন্য সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল সন্তুর। তারপর জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবুও দেখলুম রয়েছেন। তোরা কোথায় যাচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "ইজিপ্ট।"

বিমান বলল, "ইজিপ্ট ? সেখানে তোরা কোন্ ব্যাপারে যাচ্ছিস ? নিশ্চয়ই বেড়াতে নয় ?"

সন্তু এবারে একটু ভারিক্কি ভাব করে বলল, "সেটা এখন বলা যাবে না।"

বিমান অন্যদের বলল, "জানো, এই যাঁকে কাকাবাবু বলছি, তিনি একজন ফ্যানটাসটিক পার্সন। পৃথিবীতে যে-সব মিস্ট্রি অন্য

কেউ সল্‌ভ করতে পারে না, সেগুলো তিনি সল্‌ভ করার চেষ্টা করেন। যেমন ওঁর জ্ঞান, তেমনি সাহস !"

কো-পাইলট মিঃ কোহলি বললেন, "তাহলে আমরা সবাই তাঁকে একবার দেখতে চাই।"

বিমান বলল, "আর একটা মজা করা যাক। সন্তুকে আমরা এখানে আটকে রাখি, তা হলে কাকাবাবু নিশ্চয়ই এক সময়ে এখানে ছুটে আসবেন।"

ককপিটে বসে অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। প্লেনটা মেঘের রাজ্য দিয়ে যাচ্ছে বটে তবু মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে নীচের পৃথিবী। বিমান সন্তুকে বোঝাতে লাগল আকাশের মানচিত্র।

এক ঘণ্টা কেটে গেল, তবু কাকাবাবু সন্তুর কোনও খোঁজ করলেন না। বিমান বলল, "চল রে, সন্তু আমিই কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে আসি।"

দূর থেকে দেখা গেল কাকাবাবু বুকের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। ওরা কাছে যাবার পর কাকাবাবুকে ডাকতে হল না, তিনি মুখ তুলে, একটুও অবাক না হয়ে, স্বাভাবিক গলায় বললেন, "কী খবর, বিমান ?"

বিমান জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি জানতেন আমি এই প্লেনে থাকব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তা জানতুম না ! তবে জানাটা শক্ত কিছু নয়। সন্তুকে নিয়ে যাবার পরই মনে পড়ল, প্লেন টেক অফ করার পর ঘোষণা করা হয়েছিল, ক্যাপটেন ব্যানার্জি এবং তাঁর ক্রু-রা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তখন দুই আর দুইয়ে চার করে নিলুম !"

বিমান একটু হতাশ হয়ে বলল, "কাকাবাবু, আপনি কখনও চমকে যান না, বা অবাক্ হন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন হব না ? পৃথিবীতে অবাক হবার মতন ঘটনাই তো বেশি। তবে এত সামান্য ব্যাপারে ব্যস্ত হই না।"

"কাকাবাবু, মিশরে কী ব্যাপারে যাচ্ছেন, জানতে পারি ?"

"অতি সামান্য ব্যাপার !"

"তার মানে এখন বলবেন না ! ইশ্, আমাকে রিলিজ করছে আথেন্সে। যদি কায়রোতে নামতে পারতুম ! দেখি যদি ম্যানেজ করে চলে আসতে পারি। কায়রোতে আপনারা কোথায় উঠবেন ?"

"উঠবো তো ওয়েসিস হোটেলে। কিন্তু কায়রোতে আমরা দু' একদিনের বেশি থাকব না। মেমফিসে চলে যাব ! সেখানে কোথায় উঠব তার ঠিক নেই।"

সন্তু বলল, "বিমানদা, তুমি সিদ্ধার্থদাকে চেনো তো ? স্নিগ্ধাদির বর ? ওরা এখন কায়রোতে আছেন। তুমি ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে খোঁজ কোরো ! সিদ্ধার্থদা ফার্স্ট সেক্রেটারি..."

কাকাবাবু একটু ভর্ৎসনার চোখে তাকালেন সন্তুর দিকে।
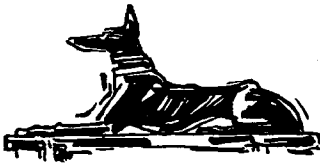
এয়ারপোর্টে যে সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা, রিনি সবাই উপস্থিত থাকবে এটা অবশ্য সন্তুও জানত না। কাকাবাবু তো আশাই করেননি। এটা নরেন ভার্মার কীর্তি, তিনি কায়রোর ইণ্ডিয়ান এমব্যাসিতে টেলেক্স পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেটা দেখে সিদ্ধার্থ নিজেই এসেছে।

কায়রোতে প্লেনটা এক ঘণ্টা থামে। বিমানও নেমে এসে

একবার ওদের সকলের সঙ্গে দেখা করে চলে গেল।

রিনি সন্তুকে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, সন্তু, কলকাতায় যখন দেখা হল, তখন তো একবারও বললি না যে, তোরা এখানে আসবি ?"

সন্তু গম্ভীর ভাবে বলল, "আমরা কখন যে কোথায় যাব, তার তো কোনও ঠিক থাকে না। আজ কায়রোতে এসেছি, পরশুই হয়তো আবার আমরা মস্কো চলে যাব !"

রিনি ঠোঁট উল্টে বলল, "ইশ্, আর চাল মারিস না ! আমরা-আমরা করছিস কেন রে ? তুই তো কাকাবাবুর বাহন ! উনি ভাল করে হাঁটতে পারেন না, তাই তোকে সঙ্গে আনেন।"

কলকাতায় থাকতে রিনি কায়রো বেড়াতে আসছে শুনে সন্তুর ঈর্ষা হয়েছিল। এখন তার মনে হল, এইসব অবোধ মেয়ের সঙ্গে কথা বলার কোনও মানেই হয় না ! সে মুখটা ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে।

সন্তুকে আরও রাগাবার জন্য রিনি বলল, "তুই সেই গল্পটা জানিস না ? চাষের খেতে একটা গোরুর শিং-এ একটা মশা বসেছিল। একজন লোক সেই মশাটাকে জিজ্ঞেস করল, ওহে মশা, তুমি এখানে কী করছ ? মশা বলল, আমরা হাল চাষ করছি ! তুই হচ্ছিস সেই মশা ! হি-হি-হি-হি !"

বেশ রাগ হয়ে গেলেও সন্তুর মনে হল, রিনি এই ধরনের কথা বলছে কেন ? ও কি তিলজলার সেই কেলেঙ্কারির ব্যাপারটা জেনে গেছে ?

সন্তু রিনির কাছ থেকে সরে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুর সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, "চলুন কাকাবাবু, বাড়িতে গিয়ে সব গল্প শুনব। আমার বাড়িটা খুব সুন্দর

জায়গায়, আপনার পছন্দ হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাড়ি ? না, সেখানে তো আমরা যাচ্ছি না !"

সিদ্ধার্থ নিরাশ হয়ে বলল, "সে কী ? আমার বাড়িতে যাবে না ? কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু মনে কোরো না। আমি হোটেল বুক করেই এসেছি। আমি যে ব্যাপারে এসেছি, তাতে তোমার জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তুমি তো সরকারি কাজ করো !"

তারপর তিনি সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই গিয়ে ওদের সঙ্গে থাকতে পারিস। বিদেশে এসে কোনও চেনা লোকের কাছে তোর থাকতে ভাল লাগবে।"

সন্তু মুখের এমন ভাব করল যেন সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষত রিনি ওরকম কথা বলার পর সে আর রিনির সঙ্গে একটা মিনিটও কাটাতে চায় না।

স্নিগ্ধা অনুযোগের সুরে বলল, "কাকাবাবু, আপনি যাবেন না ? আমি আপনাদের জন্য চিংড়ির মালাইকারি রান্না করে রেখেছি। কত কষ্টে যোগাড় করলুম চিংড়ি..."

কাকাবাবু এবারে হাল্‌কা গলায় বললেন, "তুমি কী করে জানলে যে ওই আইটেমটা আমার সবচেয়ে ফেভারিট ? ঠিক আছে, সন্ধেবেলা গিয়ে খেয়ে আসব ! কিন্তু উঠতে হবে হোটেলেই।"

ওয়েসিস হোটেলটি বিশেষ বড় নয়। শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরের দিকে। গরমকাল বলে এই সময়ে টুরিস্টদের ভিড় নেই, হোটেল প্রায় ফাঁকা। সিদ্ধার্থ, স্নিগ্ধা আর রিনি সন্তুদের ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে একটু পরে বিদায় নিয়ে চলে গেল। কথা হল যে, সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ আবার এসে ওদের নিয়ে যাবে বাড়িতে।

কাকাবাবু ঘর থেকেই দু'তিনটে টেলিফোন করলেন। তারপর তিনি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে সন্তুকে বললেন, "তুই চান-টান করে নে। আজ দুপুরে আমরা ঘরেই খেয়ে নেব। দুপুরে যা চড়া রোদ ওঠে, বাইরে বেরুনোই যায় না।"

গরমে সন্তুর গা চ্যাটচ্যাট করছিল, সে ঢুকে গেল বাথরুমে। সেখানকার জানালা দিয়ে দেখল, রাস্তা দিয়ে ট্রলি বাস চলছে। ওইটাই যা নতুনত্ব, নইলে কায়রো শহরটাকে বিদেশ বিদেশ মনে হয় না, ভারতবর্ষের যে-কোনও বড় শহরেরই মতন। ইজিপ্ট দেশটা যদিও আফ্রিকার মধ্যে, কিন্তু এখানে কালো মানুষ নেই। বর্তমান ইজিপ্টের অধিবাসীরা জাতিতে আরব।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে সন্তু দেখল, কাকাবাবু তাঁর নোটবুকে কী সব লিখছেন। সন্তু চুল আঁচড়াতে শুরু করতেই দরজায় ঠক ঠক শব্দ হল। কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন।

সন্তু দরজা খুলতেই একজন মাঝারি চেহারার লোক জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রাজ্‌জা রায়চৌধারী হিয়ার ?"

কাকাবাবু বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "মাণ্টো ? কাম ইন ! কাম ইন !"

লম্বা লোকটি প্রায় ছুটে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরলেন। একেবারে দৃঢ় আলিঙ্গন। তারপর কোলাকুলির ভঙ্গি করে তিনি সরে দাঁড়ালেন।

এই গরমেও ভদ্রলোক একটা আলখাল্লার মতন পোশাক পরে আছেন। মাথায় ফেজ টুপি, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। দাড়ি-গোঁফ কামানো।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন আলি সাদাত মাণ্টো, কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর, আমার পুরনো বন্ধু।"

মান্টো ইংরিজিতে বললেন, "রায়চৌধারী, তুমি যে এই সময় কায়রোতে এসেছ, তা শুনে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি প্রথমে। তুমি কী কাণ্ড করেছ ? জানো, এখানকার সব কাগজে তোমার কথা বেরিয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? তা হলে বেশ বিখ্যাত হয়ে গেছি বলো ! কী লিখেছে কাগজে আমার সম্পর্কে ?"

মান্টো একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে বললেন, "খুব গুরুতর অভিযোগ। এখানকার এক বিখ্যাত নেতা মুফতি মহম্মদ চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। সেখানে তিনি কয়েকদিন আগে হঠাৎ মারা যান। শেষ মুহূর্তে তিনি যে উইল করে যান, তুমি নাকি সেটা চুরি করেছ।"

কাকাবাবু অট্টহাসি করে উঠে বললেন, "ওরে বাবা রে, একেবারে চোর বানিয়ে দিয়েছে ?"

মান্টোর মুখ গম্ভীর। তিনি বললেন, "হাসির ব্যাপার নয়, রায়চৌধারী ! এখানে হানি আলকাদি নামে একজন জঙ্গি নেতা আছে। সে দাবি জানিয়েছে যে, ভারত সরকারের ওপর চাপ দিয়ে তোমাকে এখানে ধরে আনাতে হবে। আর তুমি নিজেই এখানে চলে এসেছ ? তোমার কতটা বিপদ তা বুঝতে পারছ না ?"

কাকাবাবু তবু হাল্কা চালে বললেন, "উইল যদি আমি চুরি করেই থাকি, তা হলে ভারতবর্ষে বসে থেকে লাভ কী ! মুফতি মহম্মদের বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু তো এ-দেশেই। তাই না ?"

"রায়চৌধারি, তুমি গুরুত্ব বুঝতে পারছ না। হানি আলকাদি অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। তার দলের ছেলেরা খুব গোঁড়া, নেতার হুকুমে তারা যা খুশি করতে পারে।"

"মান্টো, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, আমি কারও উইল চুরি

করতে পারি ?”

“না, না, না, আমি সে-কথা ভাবব কেন ? তোমাকে তো আমি চিনি ! তা ছাড়া মুফ্তি মহম্মদের উইল নিয়ে তুমি কী করবে ? আসলে কী হয়েছে বলো তো ?”

“তার আগে তুমি আমার দু'একটা প্রশ্নের উত্তর দাও ! মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না, এ-কথা ঠিক তো ?”

“হ্যাঁ, তা ঠিক। উনি কোনওদিন স্কুল-কলেজে যাননি, পড়তে বা লিখতে জানতেন না। তবে জ্ঞানী লোক ছিলেন।”

“উইল লেখার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। অনেকদিন ধরে ওঁর গলার আওয়াজও একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তাহলে উইল তৈরি হল কী করে ?”

“তাও তো বটে ?”

“এ সম্পর্কে তোমাদের কাগজে কিছু লেখেনি ?”

“না, কিছু লেখেনি। তবে হানি আলকাদি অভিযোগ করেছে যে, আল মামুন নামে একজন ব্যবসায়ী তোমার সঙ্গে মুফতি মহম্মদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। তারপর তুমি ওই কাণ্ডটা করেছ !”

“মাণ্টো, তোমাকে আমি আসল ঘটনাটা পরে বলব। তার আগে তুমি মুফতি মহম্মদ সম্পর্কে কী জানো আমাদের বলো তো ! তুমি কি ওঁকে চিনতে ?”

“হ্যাঁ, ইজিপ্টে তাঁকে কে না চেনে। ওঁর বয়েস হয়েছিল একশো বছর।”

“আমি শুনেছি সাতানব্বই।”

“তা হতে পারে। ওঁর জীবনটা বড় বিচিত্র। খুব গরিবঘরের সন্তান ছিলেন। ওঁর যখন সাত বছর বয়েস, তখন ওর বাবা আর মা দু'জনেই মারা যান। সাত বছর বয়েস থেকে উনি রাস্তায়

ভিক্ষে করতেন। একটু বড় হয়ে ওঠার পর শুরু করেন কুলিগিরি। তারপর তিনি হলেন বিদেশি ভ্রমণকারীদের গাইড। ইংরেজ আর ফরাসিরা যখন বিভিন্ন পিরামিডের মধ্যে ঢুকে ভেতরের জিনিসপত্র আবিষ্কার করতে শুরু করেন, সেই সময়ে তিনি অনেক অভিযানে ওদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। লেখাপড়া না শিখলেও উনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজি আর ফরাসি বলতে পারতেন। আর ওঁর গানের গলাও নাকি ছিল খুব সুন্দর। এই সময় ওঁর অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। কিন্তু উনি ওখানেই থেমে থাকলেন না। গাইডের কাজ ছেড়ে দিয়ে উনি যোগ দিলেন একটা বিপ্লবী দলে। তখন ইজিপ্টের রাজা ছিলেন ফারুক। তুমি তা জানো, রাজা ফারুককে সরিয়ে দেবার জন্য এখানকার বিপ্লবীরা কত মরিয়া হয়ে উঠেছিল। মুফতি মহম্মদ হয়ে উঠলেন একটা প্রধান বিপ্লবী দলের নেতা।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "সন্তু, তুই রাজা ফারুকের নাম শুনেছিস? রাজত্ব হারাবার পর এই ফারুক বলেছিলেন, এরপর পৃথিবীতে আর মোটে পাঁচজন রাজা থাকবে। তাসের চারটে রাজা আর ইংল্যান্ডের রাজা! হ্যাঁ, মান্টো তারপর বলো!"

মান্টো বললেন, "রাজা ফারুককে যে রাজত্ব ছেড়ে পালাতে হয়, তার পেছনে মুফতি মহম্মদের দলের অনেকটা হাত ছিল। রাজা ফারুকের পর এলেন জেনারেল নেগুইব। অনেকে তখন দাবি তুলেছিল যে, মুফতি মহম্মদেরই উচিত এ দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়া। মুফতি মহম্মদ নিজে তা কিছুতেই হতে চাননি, তিনি বলতেন যে, তিনি এক সময় রাস্তায় ভিক্ষে করতেন, রাস্তাতেই তাঁর স্থান। এর পর জেনারেল নাসের যখন প্রেসিডেন্ট হলেন, তখন মুফতি মহম্মদ ঘোষণা করলেন যে, নাসেরই সুযোগ্য ব্যক্তি, আর বিপ্লব আন্দোলন চালাবার দরকার নেই। রাতারাতি তিনি সব

কিছু ছেড়ে ফকিরের পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। তারপর আর কোনওদিন তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি। মানুষকে সৎপথে চলার উপদেশ দিতেন, নিজেও খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন। দেশের মানুষ তাঁকে একজন সর্বত্যাগী মহাপুরুষ হিসেবে শ্রদ্ধা করত।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাদের দেশের শ্রীঅরবিন্দের মতন। উনিও আগে বিপ্লবী ছিলেন, পরে সাধক হয়ে যান। মুফতি মহম্মদ কি কোনও আশ্রম করেছিলেন বা ওঁর অনেক বিষয়সম্পত্তি ছিল?"

মান্টো বললেন, "না, না, সে সব কিছু না। ওঁর অনেক ভক্তশিষ্য ছিল বটে। কিন্তু উনি নিজেকে বলতেন ফকির। ওঁর নিজস্ব কোনও সম্পত্তিই ছিল না।"

"তা হলে একজন ফকিরের উইল নিয়ে এত মাথা-ফাটাফাটি কেন? ফকিরের আবার উইল কী? অথচ আল মামুন সেই উইলের জন্যই আমাকে পাঁচ লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল। হানি আলকাদি আমার মুণ্ডু চাইছে। এটা তো বড় আশ্চর্য ব্যাপার!"

"তার কারণ আছে, রায়চৌধারী! মুফতি মহম্মদ এক সময় একটা বড় বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। হঠাৎ সেই দল ভেঙে দেন। একটা বিপ্লবী দল চালাতে গেলে প্রচুর টাকা আর অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডার রাখতে হয়। মুফতি মহম্মদের দলেও সেরকম টাকা পয়সা আর অস্ত্র ছিল। অনেকেরই প্রশ্ন, সেগুলো কোথায় গেল? তিনি নিজে কিছুই ভোগ করেননি। এখনও কয়েকটা বিপ্লবী দল এদেশে আছে, তুমি জানো নিশ্চয়ই। এই তো সেদিন এইরকম একটা দলের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতকে খুন করেছে। আমি তোমাকে চুপিচুপি বলছি, আমার ধারণা, ওই হানি আলকাদির দলের লোকেরাই এই খুনটা করেছে। তাহলেই

বুঝতে পারছ, ওরা কত সাঙ্ঘাতিক !"

"তুমি চিন্তা কোরো না, মান্টো। হানি আলকাদি আমাকে এখন খুন করবে না, যদি তার একটুও বুদ্ধি থাকে !"

"তুমি এত নিশ্চিত হতে পারছ কী করে জানি না। আচ্ছা, এবার বলো তো, মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী ? তুমি তাঁর উইল চুরি করেছ, এরকম কথা উঠছে কেন ?"

"তুমি বললে, মুফতি মহম্মদ লেখাপড়া জানতেন না। তুমি কি জানো, তিনি হিয়েরোগ্লিফিকস ভাষা জানতেন ?"

মান্টো যেন হতবাক হয়ে গেলেন কথাটা শুনে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি নিজেই তো ওই ছবির ভাষার পাঠোদ্ধার করতে পারি না। তবে, আমি তোমার কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। মনে পড়ছে যেন, বছর চল্লিশেক আগে মুফতি মহম্মদ একটা পিরামিডের ভেতরের লিপির মানে এক সাহেবকে বুঝিয়ে দিয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য অনেকে ভেবেছিল, উনি আন্দাজে বলেছেন। উনি তা হলে ওই ভাষায় উইল রচনা করে গেছেন ?"

"না। মুফতি মহম্মদ কোনও উইল করে যাননি। অন্তত আমি সে রকম কিছু জানি না। মৃত্যুর আগে উনি ওঁর শেষ একটা ইচ্ছে কাগজে ছবি এঁকে বুঝিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা আমি খানিকটা ধরতে পারি। ওঁর সেই শেষ ইচ্ছেটা এতই অদ্ভুত যে, আমি বেশ অবাক হয়েছিলুম। তাতে টাকা পয়সার কোনও ব্যাপারই নেই। আমি ছবি এঁকে ওঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আমি যা বুঝেছি তা সঠিক কি না। উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, তারপর ছবি এঁকে জানালেন যে, আমি আগে নিজে যাচাই না করে যেন কাউকে না বলি !"

"যাচাই করা মানে ? কী যাচাই করবে ?"

"সেটা যাচাই না করে তো বলা যাবে না। যাক, সে-সব পরে জানতে পারবে। এখন অন্য কথা বলা যাক। তোমার বাড়ির খবর কী ? বৌদি কেমন আছেন। তোমার ছেলে-মেয়ে ক'টি হল ?"

দু'একটা সাধারণ কথার পর মান্টো আবার বললেন, "রাজ্‌জা রায়চৌধারী, আমি তোমার সম্পর্কে সত্যি চিন্তিত। হানি আলকাদি তোমার ওপর রেগে আছে, আর তুমি এরই মধ্যে কায়রো এসে পড়েছ ! যদি টের পেয়ে যায়..."

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা ! ছাড়ো তো ! শোনো, তোমাকে আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলুম...রানি হেটেকেরিসের মমি কি শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেছে ?"

মান্টো চমকে উঠলেন। তারপর তাঁর চোখে শ্রদ্ধার ভাব ফুটে উঠল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, "তুমি এটাও জানো ! রানি হেটেকেরিসের মমি তার সারকোফেগাসের মধ্যে এক-একবার দেখা গেছে, আবার উধাও হয়ে গেছে। সবাই বলত সেটা অলৌকিক ব্যাপার। বছর তিরিশেক ধরে অবশ্য সেই মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি। হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে ?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এমনিই। প্লেনে আসবার সময় সন্তুকে ওই গল্পটা বলছিলুম কি না। তাই ভাবলুম, ও নিশ্চয়ই শেষটা শুনতে চাইবে। তিরিশ বছর ধরে রানির মমি আর দেখতে পাওয়া যায়নি ?"

মান্টো কিছু উত্তর দেবার আগেই দরজায় ঠকঠক শব্দ হল। একজন কেউ বলল, "রুম সার্ভিস। ইয়োর লাঞ্চ ইজ রেডি স্যার !"

সন্তু দরজা খুলতেই হোটেলের বেয়ারার বদলে তিনজন সশস্ত্র

লোক তাকে ধাক্কা দিয়ে ভেতরে ঢুকে এল। একজন দাঁড়াল দরজায় পিঠ দিয়ে। অন্য দু'জন লম্বাটে ধরনের রিভলভার তুলে ধরল ওদের দিকে।

মিউজিয়ামের কিউরেটার মান্টোর মুখখানা ভয়ে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল। দিনদুপুরে হোটেলের কামরার মধ্যে যে এরকম গুণ্ডামি চলতে পারে, তা তিনি যেন কল্পনাই করেননি কোনওদিন। এরা এসেছে যখন, নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে! এদের তিনজনেরই গায়ে খাকি জামা, একজনের গলায় একটা স্কার্ফ বাঁধা।

দরজায় ঠেস দেওয়া দলপতি ধরনের চেহারার লোকটি মান্টোকে বলল, "ইউ কিপ কোয়ায়েট। উই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ!"

কাকাবাবু একটুও বিচলিত না হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি হানি আলকাদির লোক? সে কোথায়?"

গলায়-স্কার্ফ-বাঁধা লোকটি চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "আমরা এখানে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে আসিনি। হুকুম করতে এসেছি। প্রফেসার, পায়ে জুতো পরে নাও, আমরা তোমাকে নিয়ে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "প্রফেসার? কে প্রফেসার? আমি তো প্রফেসার নই। তোমরা ভুল জায়গায় এসেছ!"

লোকটি পকেট থেকে একটা ফোটো বার করে দেখিয়ে বলল, "না। আমাদের ভুল হয়নি। নাউ, গেট গোয়িং!"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, পাকা কাজ! শোনো, আমাকে ওরকম ভাবে হুকুম দেওয়া যায় না। আমার এখন এখান থেকে যাবার ইচ্ছে নেই। হানি আলকাদির সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই, তাকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো, আমরা একটা জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব!"

একজন লোক রুক্ষ ভাবে কাকাবাবুকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "আরে ল্যাংড়া, চল্ শিগগির !"

কাকাবাবুর চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। চোখে জ্বলে উঠল আগুন। তিনি মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন লোক তিনটিকে। তারপর তীব্র গলায় বললেন, "দিল্লিতে আমার ওপর তিনবার অ্যাটেম্প্ট হয়েছিল, এখানেও দিনের বেলা গুণ্ডামি করতে এসেছ। তোমরা ভেবেছ কী ? আমাকে চেনো না তোমরা !"

দু'হাতের ক্রাচ দুটো তুলে তিনি বিদ্যুৎ-গতিতে মারলেন দু'জন লোকের হাতে। তাদের হাত থেকে রিভলভার ছিটকে পড়ে গেল, দু'জনেই যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল। মান্টো ভয়ের চোটে মাটিতে বসে পড়লেন। সন্তু একটা রিভলভার তুলে নেবার চেষ্টা করতেই দরজায় ঠেস-দেওয়া তৃতীয় লোকটি শান্ত গলায় বলল, "স্টপ দ্যাট ফানি বিজ্‌নেস। আই উইল শুট টু কিল !"

কাকাবাবু সেই লোকটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, "করো তো গুলি, দেখি তোমার কত সাহস ! আমায় গুলি করলে তোমার নিজের মাথা বাঁচবে ? হানি আলকাদি আমাকে জ্যান্ত অবস্থায় চায়। আমাকে মেরে ফেললে সে কিছুই আর জানতে পারবে না !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, তোমাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তুমি যদি যেতে অস্বীকার করো তা হলে তোমার পায়ে গুলি করে তোমার আর একটা পা'ও খোঁড়া করে দিতে কোনও অসুবিধে নেই। তুমি তাই চাও ?"

মাটিতে বসে থাকা অবস্থায় মান্টো বললেন, "রায়চৌধারী, প্লিজ মাথা গরম কোরো না ! ওরা যা বলে তাই-ই করো। ওদের কথা মেনে নাও !"

তৃতীয় লোকটি বলল, "প্রফেসার, তুমি ভালভাবে চলে এসো

আমাদের সঙ্গে। তোমার কোনও ক্ষতি করা হবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ভদ্রভাবে আমাকে আগে অনুরোধ করলেই পারতে। ঘরে ঢুকে গুণ্ডার মতন রিভলভার উঁচালে কেন? তোমরা গুণ্ডা না বিপ্লবী? তোমাদের দেশে আমি অতিথি হয়ে এসেছি, হানি আলকাদির উচিত ছিল নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করা।"

তৃতীয় লোকটি অনুচ্চ গলায় হেসে উঠে বলল, "তুমি সত্যি একজন অদ্ভুত লোক, তা স্বীকার করছি। হানি আলকাদির নাম শুনলেই সবাই ভয় পায়, আর তুমি তাকে ধমকাচ্ছ!"

কাকাবাবু বললেন, "তাকে আমার ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। আমি একজন ভারতীয় নাগরিক, আমার গায়ে হাত তুললে এ-দেশের সরকার হানি আলকাদিকে ছাড়বে না।"

"এখন কথা কাটাকাটি করার সময় নেই। তুমি এক্ষুনি চলো আমাদের সঙ্গে।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কোনও ভয় নেই, সন্তু। আমি আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি না ফিরি, তা হলে তোকে খবর পাঠাব। যদি কোনও খবর না পাস, তা হলে সিদ্ধার্থকে বলবি এখানকার হোম ডিপার্টমেন্টে খবরে দিতে।"

মান্টোকে বললেন, "আমার জন্য কিছু চিন্তা কোরো না, তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

তৃতীয় লোকটি সন্তুদের বলল, "আমরা এখান থেকে চলে যাবার দশ মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে বেরুবে না। পুলিশে খবর দিয়ে কোনও লাভ নেই। তোমার আংকেলের খবর আমরা যথাসময়ে জানিয়ে দেব!"

ওরা বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজায় হুড়কো লাগিয়ে দিল।

মান্টো উঠে এসে সন্তুকে ধরে বললেন, "বাপ রে বাপ ! তিন তিনটে রিভলভার। আমি আগে কক্ষনো এরকম দেখিনি। যদি একটা থেকে গুলি ফসকে বেরিয়ে আসত ! তোমার আংকল কী সাংঘাতিক লোক ! আমার এখনও পা কাঁপছে !"

কাকাবাবু যে ক্রাচ দিয়ে দুটো রিভলভারধারীকে হঠাৎ অমন মারতে শুরু করবেন, তা সন্তু এক মুহূর্ত আগেও বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর অমন রুদ্র মূর্তি সে দেখেনি কখনও আগে। এখনও তার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

এরই মধ্যে সন্তু ভাবল, এখন কী করা যায় ? কাকাবাবুকে নিয়ে ওরা সিঁড়ি দিয়ে নামছে, টেলিফোন তুলে হোটেলের রিসেপশানিস্টকে সে-কথাটা জানিয়ে দিলে হয় না ?

সন্তু সে-কথা মান্টোসাহেবকে বলতেই তিনি সন্তুর হাত চেপে ধরে বললেন, "খবর্দার, ওরকম কিছু করতে যেও না ! ওরা যা বলে গেল, তা-ই শুনতে হবে। তুমি জানো না ওরা কত নিষ্ঠুর। ঘরে ঢুকেই কেন যে ওরা গুলি চালাতে শুরু করল না, তাতেই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সেটাই ওদের স্টাইল। ওরা কাউকে কোনও কথা বলার সুযোগ দেয় না !'

সন্তুর গলা শুকিয়ে গেছে। সে জলের বোতল নিয়ে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেয়ে নিল।

তারপর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে নিয়ে বলল, "কাকাবাবু জানতেন, ওরা গুলি করবে না। বুঝলেন না, সব জিনিসটাই রয়েছে কাকাবাবুর মাথার মধ্যে। উনি নিজে থেকে না বললে কেউ ওঁর কাছ থেকে জোর করে কথা বার করতে পারবে না !"

মান্টো বিরক্তভাবে বললেন, "হুঁঃ ! কী যে ঝঞ্ঝাট ! এসো, বিছানায় বসে থাকি, দশ মিনিট কাটুক। দিনের বেলা হোটেলের ঘর থেকে একজনকে ধরে নিয়ে গেল ? ছি, ছি, ছি, কী যে হয়ে

গেল দেশটা ! দশ মিনিট বাদে আমাদের এই ঘর থেকে কে বার করবে ? যদি কেউ এসে দরজা খুলে না দেয় ?”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা মিঃ মান্টো, আপনি হানি আলকাদিকে নিজের চোখে দেখেছেন কখনও ?”

“না। দেখিনি, দেখতেও চাই না ! তবে কাগজে ছবি দেখেছি অবশ্য !”

“আমার ভয় হচ্ছে। কাকাবাবুকে কেউ হুকুমের সুরে কথা বললে উনি কিছুতেই তা শুনতে চান না। সেইজন্য ওরা রাগের মাথায় যদি কাকাবাবুকে কিছু করে বসে !”

“তোমার কাকাবাবুর উচিত ছিল এরকম কাজের ভার না নেওয়া ! মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল, তা যাচাই করে দেখা ওঁর কী দরকার ! আচ্ছা, ইয়াংম্যান, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জানো মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে কী ছিল ? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে।”

সন্তু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, “কাকাবাবু আমাকে কিছু বলেননি। তবে আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। কিন্তু মাফ করবেন, আমার আন্দাজটাও আমি আপনাকে এখন জানাতে পারব না !”

কাকাবাবু ইজিপ্টে আগে এসেছিলেন, কায়রো শহর এবং কাছাকাছি অনেকগুলো জায়গা তাঁর বেশ চেনা। এরা তাঁর চোখ বাঁধেনি। হোটেলের বাইরে এসে একটা জিপগাড়িতে তুলেছে।

পাশে কেউ রিভলভার উঁচিয়ে নেই। এরা বুঝেছে যে, এই মানুষটিকে অযথা ভয় দেখিয়ে কোনও লাভ হবে না।

কায়রো শহর থেকে পাঁচ-ছ'মাইল দূরেই তিনটি পিরামিড পাশাপাশি। কাছেই জগৎ-বিখ্যাত স্ফিংকস। এখন টুরিস্ট সিজ্‌ন না হলেও স্ফিংকসের সামনে মোটামুটি ভিড় আছে। এই দুপুরে-রোদের মধ্যেও। সেখানে রয়েছে অনেক উটওয়ালা আর ক্যামেরাম্যান। এরা টুরিস্টদের একেবারে কান ঝালাপালা করে দেয়।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, গাড়িটা এই জায়গার পাশ দিয়ে এগিয়ে চলল মেমফিসের দিকে। আগেকার তুলনায় এই রাস্তায় অনেক বেশি বাড়িঘর তৈরি হয়ে গেছে। মধ্যে-মধ্যে দু'একটা উঁচু-উঁচু সরকারি বাড়ি। আগে এ-রাস্তায় অনেক খেজুরগাছ ছিল, এখন আর চোখে পড়ে না।

মেমফিস বেশি দূর নয়। কায়রো থেকে দশ-বারো মাইল। সড়ক-পথে খানিকটা যাবার পরেই শুরু হয়ে যায় মরুভূমি। গাড়িটা কিন্তু মেমফিসের দিকে গেল না, ধুধু মরুভূমির মধ্যে ছুটতে শুরু করল।

কাকাবাবু ভাবলেন, আগেকার দিনে আরবসর্দাররা মরুভূমির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে থাকত দলবল নিয়ে। এখন আরবরা অনেক বড়লোক হয়ে গেছে, তারা এয়ার-কন্ডিশান্‌ড বাড়িতে থাকে। হানি আলকাদি কি এখনও পুরনো কায়দা বজায় রেখেছে ? নইলে এই মরুভূমির মধ্যে তাঁকে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় ? গাড়ির কোনও লোক একটিও কথা বলছে না। কাকাবাবুও তাদের কিছু জিজ্ঞেস করলেন না!

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর দূরে দেখা গেল ভাঙা দেওয়াল-ঘেরা একটা প্রাচীন প্রাসাদ। তার অনেক ঘরই ভেঙে পেড়েছে। দূর

থেকে দেখলে মনে হয় সেখানে মানুষজন থাকে না। কিন্তু কাছে এলে দেখা যায়, একটা উঁচু পাঁচিলের আড়ালে দুটো উট বাঁধা আছে আর তিনখানা স্টেশন ওয়াগন।

জিপটা থামবার পর অন্যরা কিছু বলবার আগেই কাকাবাবু নিজেই নেমে পড়লেন। ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন চারদিকটা।

একজন কাকাবাবুকে বলল, "ফলো মি!"

খানিকটা ধ্বংসস্তূপ পার হবার পর ওরা এসে পৌঁছল একটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাথরের ঘরে। সেখানে খাট-বিছানা পাতা আছে। রয়েছে একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। দেওয়ালের গায়ে একটা কাঠের আলমারি, সেটা বন্ধ।

সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল, সে কাকাবাবুকে বলল, "তুমি এইখানে বিশ্রাম নাও! তোমার কি খিদে পেয়েছে? তা হলে খাবার পাঠিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি বিশ্রাম নিতে চাই না, আমার জন্য খাবার পাঠাবারও দরকার নেই। আমি এক্ষুনি হানি আলকাদির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

লোকটি বলল, "অল ইন গুড টাইম। ব্যস্ত হচ্ছ কেন? এখন বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ। আশা করি তুমি এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করবে না। এই মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে তোমার ওই ক্রাচ নিয়ে তুমি এক মাইলও যেতে পারবে না!"

লোকটা দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কাকাবাবু চোখ বুজে, কপালটা কুঁচকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। লোকটা একটা নিষ্ঠুর সত্যি কথা বলে গেছে। একটা পা অকেজো বলে এখন আর চলাফেরার স্বাধীনতা নেই তাঁর। যে কাজের জন্য তিনি এসেছেন, তার জন্য দু'খানা জোরালো পা থাকা খুবই

দরকারি। অনেকদিন বাদে তিনি ভাঙা পা'খানার জন্য দুঃখ বোধ করলেন।

একটু বাদে কাকাবাবু শুয়ে পড়লেন খাটে। দুপুরে খাওয়া হয়নি, তাঁর বেশ খিদে পাচ্ছে, কিন্তু এদের এখানে তিনি খেতে চান না। ভেতরে ভেতরে তাঁর এখনও খুব রাগ জমে রয়েছে। একবার রাগ হলে সহজে কাটতে চায় না।

শুয়ে পড়বার পর তিনি দেখলেন বালিশের পাশে দু'খানি বই। কৌতূহলের বশে তিনি প্রথমে একটি বই তুলে নিলেন। সেটি কমপ্লিট ওয়ার্কস অব শেক্সপিয়ার। কাকাবাবু দারুণ অবাক হলেন। এই মরুভূমির মধ্যে, একটা প্রায় ভগ্নস্তূপের মধ্যে শেক্সপিয়ারের কবিতা! অন্য বইটি দেখে আরও অবাক হলেন। সেটাও ইংরেজি কবিতা, 'সং অফারিংগ্স' বাই স্যার আর এন টেগোর!

কাকাবাবু বিহ্বলভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইটা হাতে নিয়ে পাতা ওল্টালেন। বইখানি এমনি-এমনি এখানে পড়ে নেই। কেউ একজন মন দিয়ে পড়েছে। অনেক কবিতার লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া!

প্রায় আধঘণ্টা বই দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করবার পর একটা শব্দ শুনে কাকাবাবু মুখ তুলে তাকালেন।

দেওয়াল-আলমারিটার পাল্লা খুলে গেছে। সেটা আসলে একটা দরজা। তার পাশ দিয়ে নেমে গেছে মাটির নীচে সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে একজন লোক দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে।

লোকটিকে দেখে প্রথমেই কাকাবাবুর মনে হল সিনেমার নায়ক। অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা। অন্তত ছ'ফুট লম্বা, চমৎকার স্বাস্থ্য, গৌর বর্ণ, টিকোলো নাক, মাথার চুল আধা কোঁকড়ানো।

মুখে সরু দাড়ি। সে পরে আছে একটা ব্লু জিন্‌স আর ফিকে হলদে টি শার্ট। সেই শার্টে একটা সিংহের মুখ আঁকা। তার কোমরে একটা বুলেটের বেল্ট, আর দু'পাশ দুটো রিভলভার। সে দুটোর বাট আবার সাদা। লোকটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের বেশি নয়।

লোকটিকে দেখে কাকাবাবুর হাসি পেয়ে গেল।

লোকটি অর্ধেক ঠোঁট ফাঁক করে হেসে নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজিতে বলল, "হ্যালো, মিঃ রায়চৌধুরী, গুড আফটারনুন। আশা করি তোমার এখানে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি ?"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "তুমিই হানি আলকাদি ?"

লোকটি সামনের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যাঁ' বলল। তারপর মেঝেতে নেমে এসে বলল, "ঘরের মধ্যে এখনও গরম, বাইরে কিন্তু চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। চলো আমরা বাইরে গিয়ে বসি। তোমাকে আমরা ফাইনেস্ট ইণ্ডিয়ান টি খাওয়াব। সেই সঙ্গে ফিশ কাবাব ! তোমরা বেঙ্গলিরা তো ফিশ ভালবাসো !"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব প্লেজানট্রিস বন্ধ করো। আগে আমি তোমার কাছ থেকে কয়েকটা এক্সপ্লানেশান চাই। তুমি আমাকে এখানে ধরে আনিয়েছে কেন ? আমি ভারতীয় নাগরিক, আমাকে বন্দি করার কী অধিকার আছে তোমার ?"

হানি আলকাদি খুব অবাক হবার ভান করে বলল, "ধরে এনেছি ? মোটেই না ! তোমার কি হাত বাঁধা আছে ? তোমাকে আমি নেমন্তন্ন করে এনেছি। তুমিই তো শুনলুম আমার দু'জন লোককে হাতে এমন মেরেছ যে, এক বেচারির কব্জি মুচকে গেছে !"

কাকাবাবু স্থির দৃষ্টিতে হানি আলকাদির চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "তোমাদের দেশে বুঝি রিভলভার উঁচিয়ে নেমন্তন্ন

করাই প্রথা ? আমি আগেও এখানে এসেছি, অনেক নেমন্তন্ন খেয়েছি, কোনওদিন তো এরকম দেখিনি ?"

হানি আলকাদি লজ্জিত ভাব করে বলল, "আরে ছি ছি ছি, হোয়াট আ শেম ! আমার লোকেরা এরকম বাড়াবাড়ি করে ফেলে ! আমি মোটেও সেরকম নির্দেশ দিইনি । অবশ্য তোমার সব কথা শুনেটুনে ওরা একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল । মিঃ রায়চৌধুরী, আমি সত্যি বলছি, আমরা এখানে অনেকেই ভারতীয়দের খুব পছন্দ করি । আমি তোমাদের রবীন্দ্রনাথ টেগোরের খুব ভক্ত । সবাই আমাকে বিপ্লবী বলে জানে, কিন্তু আমি একজন কবিও বটে । ছদ্মনামে আমার দুটো কবিতার বই বেরিয়েছে ।"

কাকাবাবু বললেন, "রবীন্দ্রনাথের কোনও ভক্ত কোমরে দুটো পিস্তল ঝুলিয়ে রাখে, এটা দেখা আমার পক্ষে একটা নতুন অভিজ্ঞতা বটে । যাক গে যাক, আমি তোমার কাছে জানতে চাই..."

হানি আলকাদি এগিয়ে এসে কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো তুলে ধরে বলল, "তুমি বড্ড রেগে আছ । এই নাও, বাইরে চলো, আকাশটা কী সুন্দর হয়ে আছে এখন, দেখলে তোমার মন ভাল হয়ে যাবে !"

অগত্যা কাকাবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন । সেখানকার ফাঁকা চত্বরে একটা টেবিল ও দুটি চেয়ার পাতা হয়েছে । কিছু লোকজন সেখানে খাবারদাবার আর চায়ের পট সাজিয়ে দিচ্ছে । আকাশটার এক প্রান্তে টকটকে লাল । তার পরের দিকটার মেঘে অনেক রঙের খেলা । বড় অপূর্ব দৃশ্য ।

কাকাবাবু তবু বললেন, "শোনো হানি আলকাদি, আমার কতকগুলো প্রিন্সিপল্ আছে । তোমার সঙ্গে বসে আমি খাবার কেন, এক গেলাশ জলও খাব না । কারণ তুমি খুনি । তুমি বিনা

দোষে আমাকে হত্যা করবার জন্য একজনকে পাঠিয়েছিলে দিল্লিতে !"

হানি আলকাদি বলল, "তোমাকে হত্যা করতে ? মোটেই না ! তা হলে এটা দ্যাখো !" বলেই চেঁচিয়ে ডাকল, "মোসলেম ! মোসলেম !"

অমনি একজন লোক বেরিয়ে এল পাশের একটা গলি থেকে । কাকাবাবু তাকে দেখেই চিনতে পারলেন । এই লোকটাই দিল্লিতে
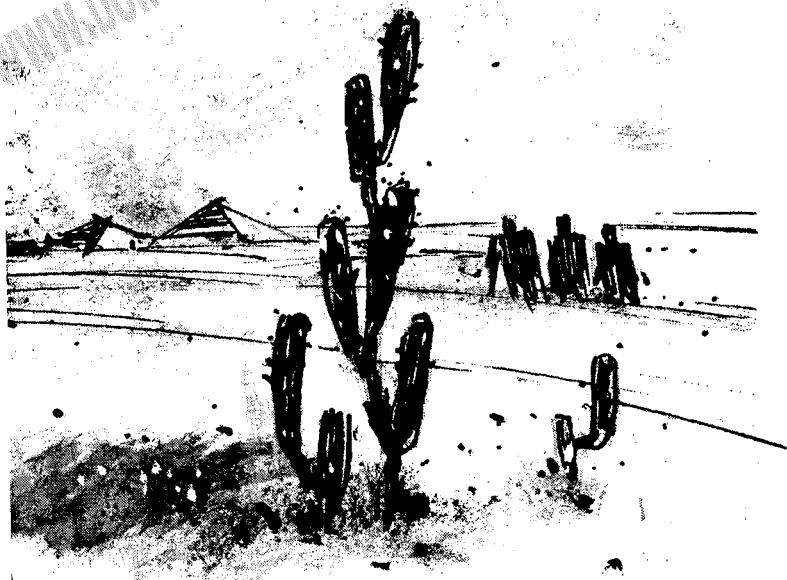
তাঁর আততায়ী হয়ে এসেছিল এক রাত্তিরে।

হানি আলকাদি অনেক দূরের একটা খেজুরগাছ দেখিয়ে সেই লোকটিকে কী যেন বলল আরবি ভাষায়। তারপর নিজের একটা রিভলভার দিল লোকটির হাতে।

লোকটি চোখ বন্ধ করে এক পাশ ফিরে গুলি করল। নিখুঁত লক্ষ্যভেদে উড়ে গেল খেজুর গাছের ডগাটা।

হানি আলকাদি যেন তাতেও খুশি হল না। লোকটির পাশে

গিয়ে ধমক দিয়ে কী যেন বলতে লাগল। লোকটি আবার রিভলভার তুলে গুলি ছোঁড়ার জন্য তৈরি হল। ট্রিগার টিপতে যাবে এমন সময় হানি আলকাদি চেঁচিয়ে বলল, "ব্লাডি ফুল! লুক বিহাইণ্ড!" বলেই লোকটির কাঁধের ওপর একটা থাপ্পড় কষাল।

লোকটি তবুও গুলি ছুঁড়ল এবং এবারেও খেজুরগাছটার ডগার খানিকটা অংশ উড়ে গেল।

হানি আলকাদি হাসতে-হাসতে কাকাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "দেখলে? দেখলে তো? এই মোসলেম আমার বডিগার্ড। পৃথিবীতে যেখানেই যাই, ওকে সঙ্গে নিয়ে যাই। ওর মাথা ঠাণ্ডা। টিপ অব্যর্থ। তোমার কাছে ওকে পাঠিয়েছিলাম শুধু তোমাকে একটুখানি আঘাত দেবার জন্য। তোমাকে প্রাণে মেরে ফেলতে চাইলে ও ঠিকই মেরে আসত! তখনও তোমার সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানতুম না। তোমাকে একটু ভয় দেখিয়ে আমাদের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম।"

হঠাৎ কাকাবাবুর একটা হাত জড়িয়ে ধরে হানি আলকাদি খুবই অনুতপ্ত গলায় বলল, "তোমাকে আঘাত দিতে হয়েছিল বলে আমি ক্ষমা চাইছি। ওই যে বললুম, তখন তোমার সম্পর্কে ভাল করে জানা ছিল না। আমরা ভেবেছিলুম, তুমি আল মামুনের একটা ভাড়াটে লোক!"

হানি আলকাদির এতখানি বিনীত ব্যবহার দেখে কাকাবাবু অভিভূত হয়ে গেলেন। কোমরে দু'দুটো পিস্তল থাকলেও লোকটি সত্যিই একজন কবি!

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, ঠিক আছে, এবারে বুঝেছি। আমার অবশ্য বেশি আঘাত লাগেনি!"

"চলো, তাহলে কিছু খেয়ে নিই। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, ভাল জাতের ভারতীয় চা একটু ঠাণ্ডা হলেই

বিস্বাদ হয়ে যায়।”

দু'জনে এসে বসলেন টেবিলে। হানি আলকাদি যত্ন করে কাকাবাবুর প্লেটে খাবার তুলে দিল। চা বানাল সে নিজেই। কাকাবাবু চা পান করতে করতে আকাশে সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

চা শেষ করে হানি আলকাদি একটা চ্যাপ্টা ধরনের সিগারেট ধরাল। তারপর কাকাবাবুর দিকে ডান হাত বাড়িয়ে বলল, “এবারে দাও!”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী?”

“মুফতি মহম্মদের উইল! তারপর আমার লোকেরা তোমাকে হোটেলে পৌঁছে দেবে।”

“যদি আমি না দিই?”

“তা হলে তুমি আমাদের এখানেই সম্মানিত অতিথি হয়ে থাকবে। আমরা রোজ তোমাকে অনুরোধ করব। যাতে তুমি দিয়ে দাও! কিংবা সেগুলো কোথায় আছে তুমি বলে দাও! মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের সম্পদ আটকে রেখে তোমার কী লাভ? তা তো তুমি নিজে ভোগ করতে পারবে না। তুমি কি তা ইজিপ্টের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে? সে সব দিন আর নেই!”

“শোনো হানি আলকাদি, তোমাদের গুরু মুফতি মহম্মদের কোনও সম্পদ ছিল কি ছিল না তা আমি জানি না। থাকলেও তা ভোগ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। তিনি তো ফকির ছিলেন শুনেছি, তাঁর সম্পদ সম্পর্কে তোমাদের এত আগ্রহ কেন?”

“ফকির হবার আগে তিনি এক বিরাট বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র আর টাকা ছিল তাঁর দলের। সে সব

কোথায় গেল ?"

"তিনি তো বিপ্লবী দল ভেঙে দিয়েছেন প্রায় চল্লিশ বছর আগে। এতদিনেও তোমরা তার সন্ধান পাওনি ?"

"না। কেউ তা পায়নি। ওঁকে কেউ ঘাঁটাতে সাহস করত না। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি নিশ্চয়ই সব বলে দিয়ে গেছেন। সেই সন্ধানই আমরা জানতে চাই! উনি যে ছবিগুলো এঁকেছিলেন, সেগুলো আমাদের দিয়ে দাও!"

"সেগুলো তো আমার কাছে নেই। আল মামুন সেগুলো শুধু আমাকে দেখতে দিয়েছে, আমাকে তো দেয়নি!"

"ইয়া আল্লা! আমরা বরাবর ভেবেছি, সেগুলো তুমিই লুকিয়ে রেখেছ। আল মামুনের একটা লোককে আমরা ধরে এনে টর্চার করেছিলুম, সেও ওই কথাই বলেছে!"

"না, তা নয়। ছবিগুলোতে কী লেখা আছে তা একমাত্র আমি জানি। ছবিগুলো আল মামুন নিজের কাছেই রেখেছে, কিন্তু ওতে কী লেখা আছে তা ও কিছুই জানে না। অবশ্য ও লন্ডনে লর্ড পেমব্রোকের কাছে ছবিগুলো নিয়ে যেতে পারে, তিনি আমার চেয়ে অনেক ভালভাবে ওগুলো ডিসাইফার করে দিতে পারবেন।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি কি জানো না, লর্ড পেমব্রোক মাত্র দু'সপ্তাহ আগে মারা গেছেন ? সুতরাং এখন পর্যন্ত শুধু তুমিই ওগুলোর অর্থ জানো! দেরি করার সময় নেই। আজই আমরা সব কিছু জানতে চাই।"

"আল মামুনও ছবিগুলোর অর্থ জানতে চেয়েছিল। তাকে বলিনি। তা হলে তোমাদের বলব কেন ?"

এই প্রথম হানি আলকাদি রেগে উঠল। টেবিলের ওপর এমন জোরে একটা ঘুসি মারল যে, কাপ-প্লেটগুলো কেঁপে উঠল ঝনঝন

করে। তার ফর্সা মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেছে।

সে বলল, "কী বলছ তুমি, আমাদের সঙ্গে ওই পিশাচটার তুলনা? আমরা বিপ্লবী, আমরা কেউ নিজেদের স্বার্থের কথা ভাবি না! আর ওই লোকটা, ওই আল মামুন, ও তো একটা ঘৃণ্য লোভী মানুষ। ওর অনেক টাকা, তবু ওর টাকার আশ মেটে না। ও মুফতি মহম্মদকে দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে নিয়ে গিয়েছিল শুধু এই লোভে যে, যদি মুফতি মহম্মদ শেষ পর্যন্ত ওকেই সব কিছুর সন্ধান বলে দেন! ওকে আমি খুন করব! নিজের হাতে।"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "সে তোমরা যা ইচ্ছে করো। এর মধ্যে আমাকে জড়াচ্ছ কেন?"

হানি আলকাদি নিজের রাগ খানিকটা সামলে নিল। তারপর সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তোমাকে জড়াচ্ছি, তার কারণ, তুমিই এখন পর্যন্ত মুফতি মহম্মদের উইলের অর্থ জানো। তুমি যদি আমাদের বলতে না চাও, তা হলে আর কেউ যাতে জেনে না ফেলে, সেজন্য আমরা তোমার মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে বাধ্য হব!"

"কাকাবাবু বললেন, "ইউ আর ওয়েলকাম। আমার কাটা মুণ্ডু কোনও কথা বলবে না!"

হানি আলকাদি এবারে হঠাৎ কাকাবাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, তুমি টেগোরের দেশের লোক, গান্ধীর দেশের লোক, তোমরা ভায়োলেন্সকে ঘৃণা করো, তা আমরা জানি। কিন্তু তোমরা তো আমাদের এদিককার দেশগুলোর অবস্থা জানো না! সে যাই হোক, তোমার মুণ্ডু কাটার কথা আমি এমনিই রাগের মাথায় বলে ফেলেছি। তুমি আমাদের বলো বা না-ই বলো, আমরা তোমার কোনওই ক্ষতি করব না। তবু আমি কাতরভাবে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমাদের দল এখন এমন অবস্থায় রয়েছে, প্রচুর টাকা ও অস্ত্রশস্ত্র না পেলে আমরা

আর কাজ চালাতে পারব না! সেইজন্যেই মুফতি মহম্মদের উইলের ওপর আমরা এত আশা রেখেছি!"

কাকাবাবু হানি আলকাদির কাঁধ ধরে বললেন, "ওঠো, চেয়ারে বোসো! শোনো, তোমাকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাকে আমি খোলাখুলি বলছি, মুফতি মহম্মদ শেষ উইল করেছিলেন কি না, তা আমি জানি না। সত্যিই জানি না!"

"মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি বিশ্বাস করছি। তা হলে বলো, ছবিতে এঁকে এঁকে উনি কী বুঝিয়েছিলেন।"

"সেটা বলতে পারো এক ধরনের ছেলেমানুষি। একজন সাতানব্বই বছরের বৃদ্ধের শেষ কৌতুক। সেটা জেনে তোমার বা আল মামুনের কোনওই লাভ হবে না। বরং আমার মতন যে-সব লোক ইতিহাসের ব্যাপারে কৌতূহলী, তাদেরই আগ্রহ হবে। মুফতি মহম্মদ আমাকে আদেশ করেছেন যে, সেটা আমি যাচাই করার আগে যেন কাউকে না বলি। সেটা যাচাই করার পর আমি তোমাকে বলব নিশ্চয়ই। কিন্তু তার আগে আমাকে তোমায় কয়েকটা সাহায্য করতে হবে।"

"কী সাহায্য বলো?"

"আমাকে একটা পিরামিডের মধ্যে ঢুকতে হবে। হয়তো একা সমাধি-কুয়োর মধ্যেও নামতে হতে পারে। এজন্য গাইড চাই, উট চাই, আরও কিছু সরঞ্জাম চাই। তুমি যদি সে-সব ব্যবস্থা করে দাও, তা হলে আমি কথা দিচ্ছি, আমি যদি কোনও গুপ্ত সম্পদের সন্ধান জানতে পারি, তবে তা তোমাকেই আগে জানাব।"

হানি আলকাদি ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "ইট্‌স্ আ ডিল! তুমি কবে রওনা হতে চাও বলো? কাল সকালে?"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দু'একটা কাজ আছে। মেমফিসে ডাগো আবদাল্লা নামে পুরনো একজন গাইডকে আমি

চিনতাম। সে যদি বেঁচে থাকে, তাকে আমার দরকার হবে। আর হোটেল ওয়েসিস থেকে আমার ভাইপো সন্তুকেও আনাতে হবে এখানে। তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, তুমি পৌঁছে দিতে পারবে?"

হানি আলকাদি বলল, "তুমি এক্ষুনি চিঠি লেখো। দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে। ডাগো আবদাল্লাও বেশ বহাল তবিয়তেই বেঁচে আছে। তাকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি।"

তারপরই সে তার লোকজনদের হুকুম করল কাগজ আর কলম আনবার জন্য। সে-সব এসে গেলে কাকাবাবু চিঠি লিখতে শুরু করলেন!

স্নেহের সন্তু,

আমি ভাল আছি। এরা আমাকে বেশ যত্নে রেখেছে। হানি আলকাদি লোকটি মন্দ না, তার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেছে। এরপর এখান থেকে আমরা একটা অভিযানে বেরুব, সেজন্য তোকে আসতে হবে এখানে। তোকে যা করতে হবে তা বলছি। এই চিঠি যে নিয়ে যাবে, সে কাল সকালে তোকে একটা উট ভাড়া করে দেবে। সেই উটে চেপে তুই মেমফিসে চলে আসবি। সেখানে স্টেপ পিরামিড আছে, চিনতে তোর অসুবিধে হবে না। অন্য পিরামিডের চেয়ে এর চেহারাটা একেবারেই আলাদা। এর বাইরের গা দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ির মতন উঠে গেছে। তুই সেখানে এসে অপেক্ষা করবি। এখানকার লোক তোকে গিয়ে নিয়ে আসবে।

চিন্তার কিছু নেই। কাল সন্ধের মধ্যেই দেখা হবে।

ইতি কাকাবাবু

পুনশ্চ: সিদ্ধার্থকে সঙ্গে আনবার কোনওই দরকার নেই।

ওকে বুঝিয়ে বলবি। আমরা যে-কাজে যাচ্ছি, তাতে সরকারি লোকজনদের না জড়ানোই ভাল। মান্টোকে বলবি। আমি আর তিন-চারদিন পরে ওর সঙ্গে মিউজিয়ামে গিয়ে দেখা করব!

বিমান বলল, "আরে সন্তু, তুই এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? কাকাবাবু তো চিঠিতে লিখেছেন সিদ্ধার্থদাকে সঙ্গে নিয়ে না যেতে। আমাদের কথা তো বারণ করেননি। তাছাড়া আমি তো সেই সেন্সে ঠিক টেকনিক্যালি সরকারি লোক নই!"

সন্তু মুখ গোঁজ করে বলল, "যাই বলো বিমানদা, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে কাকাবাবু আমাকে একলাই যেতে বলেছেন। অন্য কারও সাহায্য নেবার দরকার হলে তা নিশ্চয় জানাতেন।"

বিমান বলল, "তুই কিছু বুঝিস না। বন্দি অবস্থায় কেউ অত কিছু লিখতে পারে? ওই যে কাকাবাবু লিখেছেন না 'এরা আমাকে খুব যত্নে রেখেছে', তার মানে কী বুঝলি তো? দু'পাশে দু'জন লোক লাইট মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে!"

রিনি বলল, "আমি তো যাবই! শুধু ছেলেরাই বুঝি একা-একা অ্যাডভেঞ্চার করবে!"

বিমান বলল, "নিশ্চয়ই যাবি! আমি আথেন্স থেকে হুড়োহুড়ি করে চলে এলুম, তার আগেই দেখি যত সব কাণ্ড ঘটে গেছে। আমি থাকলে কি আর ওরা কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যেতে পারত?"

সিদ্ধার্থ জিজ্ঞেস করল, "তুমি থাকলে কী করতে, বিমান?

শুনলেই তো যে তিনজন লোক এসেছিল, উইথ আর্মস। কাকাবাবু দু'জনকে টিট করেছিলেন, কিন্তু থার্ড লোকটা ছিল সত্যিকারের টাফ্।"

বিমান বলল, "আমি থাকলে তাকে একখানা স্কোয়ার কাট ঝাড়তুম! জিজ্ঞেস করো না সন্তুকে, সুন্দরবনে 'খালি জাহাজের রহস্য' সমাধান করতে গিয়ে আমি ক'টা লোককে শায়েস্তা করেছিলুম।"

সন্তুর এ সব কথাবার্তা একদম পছন্দ হচ্ছে না। সে ছটফট করছে কখন বেরিয়ে পড়বে।

আগের দিন কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে যাবার পর সন্তু আর মান্টোসাহেব এক ঘণ্টার আগে ছাড়া পায়নি। দশ মিনিট পরে ওরা রিসেপশনে ফোন করেছিল, কেউ উত্তর দেয়নি। ফোনের লাইন কাটা ছিল। ওরা দরজায় ধাক্কা দিয়েছে, কেউ সাড়া দেয়নি। সে এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা। শেষ পর্যন্ত এক ঝাড়ুদার দরজা খুলে দিয়েছিল।

মান্টোসাহেব একটু পরেই চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু সন্তু চুপচাপ বসে ছিল ঘরের মধ্যে। সেইরকমই ছিল কাকাবাবুর নির্দেশ।

সন্ধেবেলা সিদ্ধার্থ এসে সব শুনে হতবাক। এরই মধ্যে কাকাবাবুকে গুম্ করেছে? দিনদুপুরে? সিদ্ধার্থ তক্ষুনি একটা হইচই বাধিয়ে তুলতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্তু তাকে নিষেধ করেছে। আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে যে, বিপদ দেখলে একেবারে ঘাবড়ে গেলে চলে না। কাকাবাবু বলে গেছেন কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। তার মধ্যে কোনও খবর না দিলে তারপর এখানকার গভর্নমেন্টকে জানাতে হবে। এখন চুপচাপ থাকাই ভাল।

সিদ্ধার্থ সন্তুকে তখন নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিল,

তাতেও সন্তু রাজি হয়নি। কাকাবাবু খবর পাঠাবেন এই হোটেলেই। এখানেই সন্তুকে অপেক্ষা করতে হবে। সিদ্ধার্থ বলেছিল, "তুমি রাত্তিরে এই হোটেলে একলা থাকবে ? তা হতেই পারে না। আবার যদি হামলা হয় ?"

সে-সমস্যার সমাধান হয়ে গেল একটু পরেই। রাত আটটার সময় সেই হোটেলে এসে হাজির হয়ে গেল বিমান। আথেন্স থেকে সে অন্য একটা ফ্লাইট ধরে চলে এসেছে। ঠিক হল, বিমান থাকবে সন্তুর সঙ্গে ওই হোটেল-ঘরে।

প্রায় মাঝরাত্তিরে কাকাবাবুর চিঠি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল একজন লোক। মাঝবয়েসি, মোটাসোটা গোলগাল ধরনের চেহারা। মাথাভর্তি চকচকে টাক। দেখলে বিপ্লবী বলে মনেই হয় না।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি একটি কুরিয়ার সার্ভিস এজেন্সির লোক। তাঁর এক মক্কেল এই জরুরি চিঠি পাঠিয়েছে, এবং তাঁকে বলা হয়েছে কাল সকালে একটা উট ভাড়া করে দেবার ব্যবস্থা করে দিতে। কাল ঠিক সাড়ে এগারোটায় উট তৈরি থাকবে স্ফিংকসের সামনে। এদিককার পার্টি যেন বাসে করে সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছে যায়।

বিমান সেই লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আপনার মক্কেল কে ? কোথা থেকে এই চিঠিটা এসেছে ?"

ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন, "তা বলা যাবে না। বিজনেস সিক্রেট। গুড নাইট !"

চিঠি পড়েই সন্তু ঠিক করেছিল সে একাই যাবে। কিন্তু বিমান ঝামেলা বাধাল। সন্তুকে সে কিছুতেই একা ছাড়বে না। তা ছাড়া সে নিজেও অ্যাডভেঞ্চার করতে চায়। রিনিরও সেই একই আবদার।

সন্তু অনেকবার আপত্তি করার পর বিমান বলল, "আচ্ছা, ঠিক আছে! তুই উটের পিঠে চেপে মেমফিস যাবি, আমরা বুঝি আর একটা উট ভাড়া করে তোর পাশাপাশি যেতে পারি না! অন্য টুরিস্টরা যাবে না? যে-কেউ ইচ্ছে করলে মেমফিসের পিরামিড দেখতে যেতে পারে।"

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল। স্ফিংকসের কাছে এসে সন্তু তার জন্য নির্দিষ্ট উটে চাপল, বিমান আর রিনি বসল আর-একটা ভাড়া-করা উটে।

স্ফিংকস আর কাছাকাছি পিরামিডগুলোতে সকালবেলাতেই অনেক টুরিস্ট এসেছে। সন্তু সতৃষ্ণভাবে একবার স্ফিংকসের দিকে তাকাল। তার ভাল করে দেখা হল না।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, সন্ধেবেলা এখানে সনে-লুমিয়ের হয়। আলোর খেলাতে পুরনো মিশরের ইতিহাস দেখতে পাওয়া যায়।"

রিনি বলল, "আমাদের দিল্লিতে লালকেল্লায় যে-রকম আছে?"

সন্তুর এ-সব কথায় মন লাগছে না। সে খালি ভাবছে, কখন কাকাবাবুর কাছে পৌঁছবে। সে শুনেছে, আরব গেরিলারা মানুষ খুন করতে একটুও দ্বিধা করে না।

উটের পিঠে চাপার অভিজ্ঞতাও সন্তুর এই প্রথম। সমস্ত শরীরটা দোলে। সামনে ধুধু করছে মরুভূমি। সন্তুর হঠাৎ যেন সব ব্যাপারটাই অবিশ্বাস্য মনে হল। সে স্বপ্ন দেখছে না তো? সত্যিই কি সে উটের পিঠে চেপে মরুভূমি পার হচ্ছে?

মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

ইহার চেয়ে হতেম যদি আরব বেদুইন
চরণতলে বিশাল মরু দিগন্তে বিলীন!

পাশ থেকে বিমান বলল, "দেখবি কাল গায়ে কীরকম ব্যথা

হয়। তখন উটে চড়ার মজাটা টের পাবি। বিছানায় শোবার বদলে সারা রাত ইচ্ছে করবে দাঁড়িয়ে থাকতে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি আজই ফিরে আসব ?"

বিমান বলল, "এই রে, এরই মধ্যে ফেরার চিন্তা ? চল্ তা হলে এক্ষুনি তোকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

রিনি বলল, "মোটেই না ! আমি সে-কথা বলছি না। আমি বলছি, পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে ?"

বিমান বলল, "দু'ঘণ্টাও লাগতে পারে, আবার সারাদিনও লেগে যেতে পারে। উটের যেরকম মেজাজ মর্জি হবে।"

রিনি জিজ্ঞেস করল, "এই সন্তু, তুই কথা বলছিস না কেন রে ? তুই গোমড়া মুখে রয়েছিস সকাল থেকে..."

গতকাল এয়ারপোর্টে রিনি যে সন্তুকে অপমান করেছিল তা বোধহয় সে নিজেই ভুলে গেছে। তারপর থেকেই সন্তুর আর কথা বলার ইচ্ছে নেই রিনির সঙ্গে।

সন্তুর উটটা যে চালাচ্ছে, তার বয়েস প্রায় সন্তুরই সমান। সে দু'চারটে ইংরেজি শব্দ মোটে জানে। সন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলে 'ইয়েস, মাস্টার, নো মাস্টার' বলে।

ওদের দুটো উট ছাড়া আর কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না উটের পিঠে চেপে। অসহ্য গরম, রোদ একেবারে গনগন করছে। এত গরমেও কিন্তু একটুও ঘাম হয় না।

মাত্র আধ ঘণ্টা চলার পরেই মনে হল দূর থেকে একটা বিশাল কালো রঙের ধোঁয়ার কুণ্ডলী তেড়ে আসছে ওদের দিকে। বিমান চেঁচিয়ে বলল, "এই রে, সর্বনাশ, ঝড় আসছে !"

সন্তুর উট-চালক মুখ ঘুরিয়ে বলল, "নো অ্যাফ্রেড মাস্টার ! নো ডেঞ্জার !"

দু'জন চালকই তাদের দুটো উটকে বসিয়ে দিল মাটিতে।

সন্তুরা নেমে পড়ল চটপট। সবাই মিলে উটের পিঠের আড়ালে বসল। বিমান বলল, "ঝড়ের ধুলো একদিক থেকে আসে তো, তাই একটু আড়ালে বসলেই গায়ে কিছু লাগে না।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "ঘূর্ণিঝড় হয় না?"

বিমান বলল, "তাও হয় মাঝে-মাঝে। তখন উপুড় হয়ে শুয়ে মুখ গুঁজে থাকতে হয় আর কান ঢাকা দিতে হয়।"

রিনি বলল, "কী দারুণ লাগছে! ঠিক সিনেমার মতন। আজই ফিরে গিয়ে মা'কে একটা চিঠি লিখব।"

বিমান বলল, "তুই এখনও ভাবছিস আজই ফিরবি? মেমফিসে তোকে একটা রেস্ট হাউসে রেখে আমি আর সন্তু যাব কাকাবাবুর কাছে।'

রিনি বলল, "আহা-হা, অত শস্তা নয়। আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে!"

এর পরেই মাথার ওপর দিয়ে ঝড় এসে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক, কিছুই আর দেখা যায় না। সেই সঙ্গে প্রচণ্ড শনশন শব্দ। ওরা কান ঢেকে মুখ নিচু করে রইল, আর কথা বলারও উপায় নেই।

সেই ঝড় যেন আর থামতেই চায় না। কতক্ষণ যে চলল তার ঠিক নেই। উট দুটো মাঝে-মাঝে ভ-র-র-র ভ-র-র-র করে জোরে নিশ্বাস ফেলছে, শুধু সেই শব্দ ঝড়ের শব্দ ছাপিয়েও শোনা যায়।

যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনই হঠাৎ ঝড় শেষ হয়ে গেল এক সময়। আকাশ একেবারে পরিষ্কার।

সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। আগে মরুভূমিটা ছিল সমতল। এখন কাছাকাছি অনেকগুলো বালির পাহাড় তৈরি হয়ে গেছে। বেশি দূর পর্যন্ত আর দেখা যায় না।

বিমান বলল, "ঝড় হয়ে যাবার এই আর এক মুশকিল। এই সব স্যাণ্ড ডিউনস পার হতে উটগুলোর বেশি সময় লাগে।"

আবার ওরা চেপে বসল উটের পিঠে। আর কোনও ঘটনা ঘটল না। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে যাত্রা। তারপর দূরে দেখা গেল কয়েকটি পিরামিডের চূড়া, আর মেমফিস শহরের চিহ্ন।

বিমান বলল, "জানিস সন্তু, এই মেমফিস ছিল মিশরের প্রাচীন রাজধানী। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা। তখনও আমাদের দেশে আর্য-সভ্যতার জন্ম হয়নি।"

সন্তু মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে বলল, "স্টেপ পিরামিড কোথায় ? ওই তো, ওই যে ! সত্যি দেখলেই চেনা যায়।"

রিনি বলল, "ওই পিরামিডটার ছবি অনেক বইতে দেখেছি। আচ্ছা বিমানদা, বেশির ভাগ বইতে ওই পিরামিডটার ছবিই দেয় কেন ? আরও তো কত পিরামিড রয়েছে।"

বিমান বলল, "কারণ এই পিরামিডটাই সবচেয়ে প্রাচীন। একেবারে প্রথম তৈরি করা হয়েছিল।"

সন্তু উটওয়ালাকে ওই পিরামিডের দিকে যেতে বলল।

স্টেপ পিরামিডের গায়ে ধাপে-ধাপে খাঁজ কাটা আছে। দূর থেকে সিঁড়ির মতন দেখালেও কাছে এলে বোঝা যায় ধাপগুলো অনেক উঁচুতে। সহজে বেয়ে ওঠার উপায় নেই।

ওরা উট থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখানে আর কোনও লোক নেই।

উটওয়ালা দু'জন বলল, "গাইড কল মাস্টার ? ফিফটি পিয়াস্তা ! মি গিভ ফিফটি পিয়াস্তা !"

সন্তু বলল, "না, গাইডের দরকার নেই। আমাকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।"

রিনি বলল, "বাবা রে, একটাও মানুষজন নেই। আমাদের যদি এখানে মেরে পুঁতে রাখে, কেউ টেরও পাবে না।"

এতক্ষণ বাদে সন্তু রিনিকে বলল, "অতই যদি ভয়, তা হলে কে আসতে বলেছিল তোকে ?"

রিনি বলল, "বেশ করেছি !"

তারপর সে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল।

বিমান বলল, "চিঠিটা জেনুইন ছিল তো ? আমি কাকাবাবুর হাতের লেখা চিনি না।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, জেনুইন। তা ছাড়া এখানে আর কে বাংলাতে চিঠি লিখবে ?"

খানিকবাদে দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল।

সন্তু বলল, "ওই আসছে !"

রিনি বলল, "মরুভূমিতে যদি জিপগাড়ি চলে, তা হলে আর উটে চড়বার দরকার কী ? আমার বিচ্ছিরি লেগেছে !"

জিপটা কাছে এসে থামতেই তার থেকে একজন বলশালী লোক নামল। লোকটি যত না লম্বা, তার চেয়ে বেশি চওড়া।

সে প্রথমেই সন্তুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "সোনটু ? সোনটু ? মি ডাগো আবদাল্লা। মি কাম ফ্রম রায়চৌধুরী। ইউ কাম উইথ মি !"

বিমান বলল, "তোমার কাছে রায়চৌধুরীর কোনও চিঠি আছে ?"

ডাগো আবদাল্লা মাথা নেড়ে জানাল, না।

বিমান বলল, "তা হলে আমরা কী করে বিশ্বাস করব !"

আচমকা যে-রকম মরুভূমিতে ঝড় উঠেছিল, ঠিক সেইরকমভাবে আচমকা একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড ঘটল।

স্টেপ পিরামিডের আড়াল থেকে খুব জোরে ছুটে এল একটা স্টেশন ওয়াগন। বিকট শব্দ করে সেটা ব্রেক কষল ডাগো আবদাল্লার ঠিক পেছনে। চাপা পড়বার আগে ডাগো একটা লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দিকে।

গাড়ি থেকে টপটপ করে নেমে পড়ল চারজন লোক। তাদের প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। তাদের মধ্যে একজন অতিকায় চেহারার লোক প্রায় এক হাতেই সন্তুকে একটা বেড়ালছানার মতন উঁচুতে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুঁড়ে দিল গাড়ির মধ্যে।

রিনি ভয়ে চিৎকার করে উঠল।

একজন লোক বিমানের দিকে ফিরে বলল, "ইউ গো ব্যাক।"

আর-একজন লোক মাটিতে পড়ে থাকা ডাগো আবদাল্লার পিঠের ওপর নিজের বুটজুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়েছে। কর্কশ গলায় সে বলল, "হেই ডাগো, ইউ ওয়ান্ট টু ডাই ?"

রাগে, অপমানে ডাগো আবদাল্লার মুখখানা অদ্ভুত হয়ে গেছে। মানুষটার অতবড় চেহারা, কিন্তু চারখানা রাইফেলের বিরুদ্ধে সে কী করবে। ডাগো ডাগো যে জিপে এসেছে, তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার। তার দিকেও একজন রাইফেল উঁচিয়ে আছে।

ডাগোর পিঠে যে পা তুলে আছে, সে আবার জিজ্ঞেস করল, "ডাগো, তুই মরতে চাস ? আমি ঠিক পাঁচ গুনব !"

ডাগো ফিসফিস করে বলল, "নো, এফেন্ডি !"

লোকটি পা'টা সরিয়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা কাগজ বার করল। সেটা ডাগোর মুখের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "এটা তোর মালিককে দিবি ! বলবি, বারো ঘণ্টার মধ্যে উত্তর চাই !"

ডাগো আস্তে-আস্তে মাটি থেকে উঠল। দুটো রাইফেল তাক করা রয়েছে তার দিকে। চিঠিটা হাতে নিয়ে সে আস্তে আস্তে হেঁটে গিয়ে জিপে উঠল।

একজন হুকুম দিল, "স্টার্ট !"

জিপটা চলতে শুরু করার পরেও কিছুক্ষণ রাইফেলের নল তোলা রইল সেদিকে।

জিপটা চোখের আড়ালে চলে যাবার পর ওরা বিমান আর রিনির দিকে ফিরল। রিনি মুখে হাত চাপা দিয়ে আছে, তার সারা শরীর কাঁপছে। বিমান তাকিয়ে আছে অসহায় ভাবে। সন্তুকে নেবার জন্য দুটো দলের লোক এসেছে। এর মধ্যে কারা যে কোন্ দলের, তা সে বুঝতে পারছে না। তার নিজেরও কিছুই করার নেই। সুন্দরবনের ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা আর আরব গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করা তো এক কথা নয়। এরা প্লেন ধ্বংস করে, ডিনামাইট দিয়ে গোটা বাড়ি উড়িয়ে দেয়।

রাইফেলের নল দোলাতে দোলাতে একজন বলল, "গেট গোয়িং ! গেট গোয়িং !"

রিনির হাত ধরে বিমান এক পা এক পা করে পিছিয়ে গেল। ওদের উটওয়ালা ততক্ষণে তার উটটাকে বসিয়ে ফেলেছে। বিমান রিনিকে নিয়ে চেপে বসল উটের পিঠে।

ওদের একজন এবার অকারণেই আকাশের দিকে রাইফেল তুলে একবার ট্রিগার টিপল। সে আওয়াজে উট দুটোই দৌড় দিল তড়বড়িয়ে।

স্টেশন ওয়ানটা সন্তুকে নিয়ে চলে গেল উল্টো দিকে।

ওদিকে হানি আলকাদি কাকাবাবুর অভিযানের সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। উটের বদলে কাকাবাবু যাবেন গাড়িতে, তাতে সময় বাঁচবে। হানি আলকাদিও যাবে অন্য একটি গাড়িতে। কাকাবাবুর সঙ্গে তার শর্ত হয়েছে যে, হানি আলকাদি তার দলবল নিয়ে অপেক্ষা করবে গিজাতে। সেখান থেকে সে আর এগুতে

পারবে না। কাকাবাবুর সঙ্গে শুধু যাবে সন্তু আর ডাগো আবদাল্লা। কাকাবাবু যদি চার ঘণ্টার মধ্যে ফিরে না আসেন, তা হলে হানি আলকাদি তাঁর খোঁজ নিতে যাবে।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত কাকাবাবু একাই কাটিয়েছেন। হানি আলকাদির দেখা পাওয়া যায়নি। অন্য লোকজনও বিশেষ কেউ ছিল না মনে হয়। সন্ধের দিকে এক-এক করে সব আসতে লাগল। এরা বিপ্লবী হলেও দিনের বেলায় নিশ্চয়ই অন্য কাজ করে।

অন্ধকার হয়ে আসার পর কয়েকটা মশাল জ্বালা হল চত্বরে। কাকাবাবু বাইরেই চেয়ার পেতে বসে ছিলেন, এক সময় সেখানে হাতে একটা মশাল নিয়ে উপস্থিত হল হানি আলকাদি। আজ তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। জলপাই-সবুজ রঙের পোশাক পরা, মাথার চুলে একটা রিবন বাঁধা। চোখ দুটো একেবারে ঝকঝক করছে।

হাসিমুখে সে বলল, "হ্যালো, প্রফেসার! হাউ আর ইউ দিস ইভনিং?"

কাকাবাবুও হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা অনেকেই আমাকে প্রফেসার বলো কেন? আমি তো কখনও কোনও কলেজে পড়াইনি!"

হানি আলকাদি বলল, "ওঃ হো! আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের এখানে অনেক কলেজেই আগে ইন্ডিয়ান প্রফেসাররা পড়াতেন। সেইজন্য কোনও ডিগনিফাইড চেহারার ইন্ডিয়ান দেখলেই আমাদের প্রফেসার মনে হয়। যাই হোক, তুমি একা-একা বিরক্ত হয়ে যাওনি তো? বাইরে বসে আকাশের রং-ফেরা দেখেছিলে?"

"সূর্যাস্তের সময় এখানকার আকাশ সত্যি বড় অপূর্ব দেখায়।

দুপুরে একবার ঝড় উঠেছিল, তারপর আকাশ আবার ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল !"

"মিঃ রায়চৌধুরী, একটা কথা বলতে পারেন ? পৃথিবীর থেকে আকাশের রং আমার বেশি সুন্দর লাগে। আকাশে নীল, সাদা, লাল সোনালি, রুপোলি, কালো সব রং-ই দেখা যায়। কিন্তু সবুজ রং কখনও দেখা যায় না কেন ? আমি প্রায়ই এ কথাটা ভাবি।"

কাকাবাবু জোরে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, "তোমাকে দেখার আগে তোমার সম্পর্কে কত কথাই শুনেছিলুম। তুমি নাকি সাঙ্ঘাতিক এক বিপ্লবী, ভয়ংকর নিষ্ঠুর। এখন তো দেখছি তুমি একটি স্বপ্ন-দেখা নরম স্বভাবের যুবক।"

হানি আলকাদি একটু লজ্জা পেয়ে বলল, "যারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে জানে না, তারা কী করে বিপ্লবী হবে ?"

তারপর হাতঘড়ি দেখে বলল, "ইয়োর নেফিউ শুড বি হিয়ার এনি মিনিট। তুমি কি আজ রাত্তিরেই বেরিয়ে পড়তে চাও।"

কাকাবাবু বললেন, "যতটা এগিয়ে থাকা যায়, ততটাই ভাল। কাল ভোর থেকে কাজ শুরু করা যেতে পারে।"

মশালটা বালিতে গেঁথে হানি আলকাদি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, "মুফতি মহম্মদ ছবির উইলে কী লিখে গেছেন, তা জানার জন্য আমার খুবই কৌতুহল হচ্ছে। তুমি তা বলবে না, না ?"

কাকাবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আর একটু ধৈর্য ধরো !"

এই সময় গাড়ির শব্দ হতেই দু'জনে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

গাড়িটা হেডলাইট জ্বেলে এদিকেই আসছে। হানি আলকাদি বলল, "তোমার ভাইপো এসে গেছে !"

গাড়িটা থামতেই ডাগো আবদাল্লা ছুটে এল ওদের দিকে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

অতবড় চেহারার একটি লোককে শিশুর মতন কাঁদতে দেখে কাকাবাবু প্রথমে অবাক হলেও সঙ্গে-সঙ্গে বুঝে গেলেন কী ঘটেছে।

হানি আলকাদি প্রায় লাফিয়ে উঠে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? ছেলেটাকে আনিসনি ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "আমাকে যা খুশি শাস্তি দাও, এফেন্দি ! আমার চোখের সামনে থেকে ছেলেটাকে কেড়ে নিয়ে গেল। আমি কিছুই করতে পারিনি। ওদের চারটে রাইফেল ছিল।"

হানি আলকাদি চিৎকার করে বলল, "বেওকুফ, আগে বল, কারা নিয়ে গেছে ! তুই তাদের চিনেছিস ? কাদের এত সাহস যে, আমার লোকের ওপর হাত দেয় ?"

ডাগো আবদাল্লা বলল, "হ্যাঁ চিনি এফেন্দি। ওরাও আমাকে চিনেছে। আমার নাম ধরে ডাকল। ওরা আল মামুনের লোক !"

হানি আলকাদির সুন্দর মুখখানা এবারে রাগে একেবারে হিংস্র হয়ে উঠল। সে ডাগো আবদাল্লার চুলের মুঠি ধরে বলল, "সেই কুকুরটা তোর সামনে থেকে ছেলেটাকে নিয়ে গেল, তুই বেঁচে ফিরে এলি ? ওদের একটাকেও তুই খতম করেছিস ? আল মামুন ! আজ আমি ওকে শেষ করে দেব। নিজের হাতে ওকে একটু-একটু করে কাটব !"

ডাগোকে ছেড়ে দিয়ে হানি আলকাদি হাততালি দিয়ে নিজের লোকদের ডাকতে লাগল।

ডাগো বলল, "একটা চিঠি দিয়েছে। বলেছে, বারো ঘন্টার মধ্যে উত্তর চাই।"

কাকাবাবু আরবি ভাষা মোটামুটি জানেন। ওদের কথাবার্তা প্রায় সবটাই বুঝতে পারছিলেন। এবারে হাত বাড়িয়ে বললেন, "দেখি চিঠিটা।"

চিঠিখানা কাকাবাবুকে উদ্দেশ করে লেখা নয়। লিখেছে হানি আলকাদিকে। চিঠিটা এই রকম :

আল মামুন নিজে হানি আলকাদির মতন একজন নগণ্য, নির্বোধ লোককে চিঠি লেখার যোগ্য মনে করে না। আল মামুন তার দলের একজন লোক মারফত জানাচ্ছে যে, মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে বন্দি করে রাখার কোনও অধিকার হানি আলকাদির নেই। মিঃ রাজা রায়চৌধুরী আল মামুনের লোক। আল মামুনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী আল মামুন, তার কথা সবাই মান্য করবে। যে আল মামুনের অবাধ্য হবে, সে শাস্তি পাবে। হানি আলকাদি যদি ১২ ঘন্টার মধ্যে আল মামুনের আদেশ না পালন করে, তা হলে সে কঠিন শাস্তি পাবে। মিঃ রাজা রায়চৌধুরীকে যেন জানিয়ে দেওয়া হয় যে, ১২ ঘন্টা পরে হলে তাঁর ভাইপো খুন হবে, তার মৃতদেহ কেউ খুঁজে পাবে না। নির্বোধ হানি আলকাদি যেন আরও বেশি নির্বোধের মতন কাজ না করে।

চিঠিটা পড়ার সময় কাকাবাবু কোনও উত্তেজনার চিহ্ন দেখালেন না। শান্ত ভাবে চিঠিটা এগিয়ে দিলেন হানি আলকাদির দিকে।

হানি আলকাদি চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন লাফাতে লাগল। পড়া হয়ে গেলে কাগজটা গোল করে পাকিয়ে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তার ওপরে লাথি কষাল কয়েকটা। সেই সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল, "একটা আলুর বস্তার ইঁদুর ! বাঁধা কপির পোকা ! নর্দমার আরশোলা ওই আল মামুনটাকে আমি টিপে মেরে ফেলব ! আজ রাতে আমার ফোর্স নিয়ে গিয়ে ওই বাঁদরের গায়ের উকুনটাকে আমি সবংশে শেষ করব।"

কাকাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, "হানি আলকাদি, এখন

চ্যাঁচামেচি করার সময় নয়, আমি তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলতে চাই !"

হানি আলকাদি এগিয়ে আসতে-আসতে বলল, "তুমি চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী, হানি আলকাদি যখন রেগে গেছে, তখন আল মামুন আজই খতম্ হবে। মরুভূমিতে বালি আজ আল মামুনের রক্ত শুষবে ! বাজপাখিরা আল মামুনের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে।"

কোমর থেকে সে এমন ভাবে রিভলভার বার করল, যেন আল মামুন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, এক্ষুনি সে গুলি করবে।

এর মধ্যে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেছে চারপাশে। তারা ডাগো আবদাল্লার কাছ থেকে ঘটনাটা শুনছে।

কাকাবাবু হানি আলকাদিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শোনো, আল মামুনকে তো আমি ব্যবসায়ী বলেই জানতাম। কিন্তু তারও কি তোমার মতন দল আছে নাকি ? সে এত রাইফেলধারী পেল কোথায় ?'

"আছে একটা ছোট দল। সে এমন কিছু না। আমার দলে হাজার-হাজার লোক আছে। ওকে আমরা, এই দ্যাখো, এইরকম ভাবে একটা মুরগির মতন জবাই করব।"

"তোমাদের দু'দলের কি আগে থেকেই ঝগড়া ছিল ?"

"ওর দলকে আমরা গ্রাহ্যই করি না। ওর দল ধর্মীয় গোঁড়ামি ছড়াতে চায়, আর আমায় দল চায় দেশের সব মানুষের উন্নতি।"

এর আগে আমরা ওদের নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু আল মামুনের দল যদি আমার পথে বাধা সৃষ্টি করে, তা হলে আমি ওদের শেষ করে দেব। মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী ওকে কে করেছে ? আমিই মুফতি মহম্মদের আসল উত্তরাধিকারী।"

"আল মামুন বুদ্ধিমান লোক। আমার ভাইপো সন্তুকে সে

কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তুমি কী করে খুঁজে বার করবে ?”

“আমার হাত ছাড়িয়ে পালাবার ক্ষমতা আছে আল মামুনের ? আমি আগে ওর মাথার খুলিটা গুঁড়ো করে দেব !”

“তার আগেই যদি ওরা সন্তুকে মেরে ফেলে ?”

“তুমি অযথা চিন্তা কোরো না, রায়চৌধুরী...”

“হ্যাঁ, চিন্তা আমাকে করতেই হবে। তোমাদের দু'দলের ঝগড়ার মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না। আল মামুন মাত্র বারো ঘন্টা সময় দিয়েছে ! তার শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই !”

“অ্যাঁ ? কী বলছ তুমি ? ওই শয়তানের দাঁতের ময়লাটা ভয় দেখালেই আমরা ভয় পেয়ে যাব ? তা হতেই পারে না !”

“মাত্র বারো ঘন্টা সময়। এর মধ্যেই সন্তুকে আমি ফেরত চাই। কোনও ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শোনো, আমি দুটো উপায় ভেবেছি। এক হচ্ছে, আমাকে ফেরত পাঠানো। আল মামুন তার চিঠিতে শুধু আমাকেই ফেরত দিতে বলেছে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও !”

“মিঃ রায়চৌধুরী, তোমাকে আমি সাহসী মানুষ বলে ভেবেছিলুম। আল মামুনের হুকুম তুমি মেনে নেবে ? তুমি কি ওর ক্রীতদাস ? তোমাকে ও হাফ মিলিয়ান ইন্ডিয়ান টাকা দিতে চেয়েছিল, তুমি তা নাওনি, সে খবরও আমি জানি !”

“শোনো আলকাদি। ওই সন্তু ছেলেটাকে আমি বড্ড ভালবাসি। ওর কোনও ক্ষতি হলে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমার দলের এত শক্তি, তবু তোমার আমার ভাইপোকে এখানে আনার ব্যবস্থা করতে পারলে না, মাঝপথ থেকে ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ওকে বাঁচাবার জন্য আমাকে ফিরে যেতে হবে।”

"যদি আমরা তোমাকে না ছাড়ি ? আল মামুনের হুকুম আমি কিছুতেই মানব না !"

"তোমাদের দুই দলের ঝগড়ার জন্য আমার ভাইপোটা মারা যাবে ? হানি আলকাদি, তোমাকে দেখে আমি যা বুঝেছি, তুমি বীর, তুমি লড়াই করতে ভালবাসো, কিন্তু কোনও ছোট ছেলেকে নিশ্চয়ই তুমি কোনওদিন মারতে পারবে না ! কিন্তু আল মামুন তা পারে।"

"তুমি দুটো উপায়ের কথা বলছিলে। দ্বিতীয়টা কী ?"

"আল মামুনকে তুমি একটা চিঠি লেখো। সে যেমন তোমাকে ধমকিয়েছে আর গালাগালি দিয়েছে, সেই রকম তুমি যত খুশি ধমক আর গালাগালি দাও। সেই সঙ্গে লেখো যে, সন্তুকে আজ রাতের মধ্যেই এখানে ফেরত পাঠাতে হবে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছে যাচাই করতে গিয়ে যদি আমি কোনও ধন-সম্পদের সন্ধান পাই, তা হলে তুমি তার অর্ধেক আল মামুনকে দেবে ! তুমি আরব যোদ্ধা, তোমার কথার দাম আছে। তুমি কথা দিলে নিশ্চয়ই তা রাখবে !"

"অসম্ভব ! অসম্ভব ! অসম্ভব ! মুফতি মহম্মদ বিপ্লবী নেতা ছিলেন। বিপ্লবী দলের জন্যেই তিনি টাকাপয়সা সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেইসব জিনিস এখানকার বিপ্লবী দলই পাবে। আল মামুনটা কে ? একটা অর্থলোভী শয়তান !"

"হয়তো টাকাপয়সা কিছুই নেই। তোমরা এমনি-এমনি ঝগড়া করছ ?"

"নিশ্চয়ই আছে। থাকতে বাধ্য।"

"শোনো আমার সাহায্য যদি চাও, তা হলে আমার কথা মানতেই হবে। তুমি কি এটা বোঝোনি যে, আমি যদি নিজে থেকে বলতে না চাই, তা হলে আমাকে খুন করে ফেললেও আমি

মুখ খুলব না !"

"আল মামুনকে টাকাপয়সার ভাগ দিলে আমার দলের লোকরা রেগে যাবে।"

"দলের লোকদের বোঝাও ! সন্তুকে যদি বাঁচাতে না পারো, তা হলে তোমরা কিছুই পাবে না ! সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ডাগো আবদাল্লার হাতে এক্ষুনি চিঠি লিখে স্টেপ পিরামিডের কাছে পাঠাও।"

হানি আলকাদির মুখখানা কুঁকড়ে গেছে। আল মামুনকে হত্যা করার বদলে তাকে টাকাপয়সার ভাগ দিতে হবে, এই ব্যাপারটা সে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। তার মনের মধ্যে অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে।

কাকাবাবু তার পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "শূন্যকে যদি দু'ভাগ করা যায় ? মনে করো, মুফতি মহম্মদের ধনসম্পদ শূন্য। তার অর্ধেক আল মামুনকে দিতে তুমি আপত্তি করছ কেন ?"

হানি আলকাদি পাশ ফিরে তার দলের একজন লোককে বলল, "এই, চিঠি লেখার কাগজ আর কলম নিয়ে এসো !"

সন্তুর মাথায় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। তাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে রাত তিনটের সময়। আল মামুনের লোকেরা তাকে যখন গাড়ির মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, তখন একটা লোহার রডে লেগে তার মাথা ফেটে যায়। মাথার চুল একেবারে ভিজে গিয়েছিল রক্তে। আল মামুনের লোকেরা তা দেখেও তার কোনও চিকিৎসার ব্যবস্থা

করেনি। ডাগো আবদাল্লা তাকে এখানে ফিরিয়ে আনবার পর হানি আলকাদি নিজে তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে, ওষুধ লাগিয়ে, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছে।

সন্তু কিন্তু বেশ চাঙ্গাই আছে। ওই আঘাতে সে একটুও কাবু হয়নি। কিংবা হলেও বাইরে তা প্রকাশ করছে না। বরং তার একটু আনন্দই হচ্ছে। দিল্লিতে পাঁজরায় গুলি খেয়ে কাকাবাবু কয়েকদিন ব্যান্ডেজ বেঁধে ছিলেন, এখন সেও অনেকটা কাকাবাবুর সমান-সমান হল।

ভোরের আলো ফোটার আগেই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়েছেন সন্তুকে নিয়ে। সঙ্গে শুধু ডাগো আবদাল্লা। সে-ই চালাচ্ছে গাড়ি। হানি আলকাদি তার কয়েকজন অনুচর নিয়ে যাচ্ছে অন্য গাড়িতে। সন্তু সুস্থ আছে দেখে কাকাবাবু আর দেরি করতে চাননি। কাজটা তিনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চুকিয়ে ফেলতে চান।

গাড়িতে যেতে-যেতে কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, তুই জানিস পিরামিডের মধ্যে কী করে ঢুকতে হয়? তোর কি ধারণা যে, পিরামিডের গায়ে একটা দরজা থাকে আর সেই দরজা খুলে ভেতরে ঢোকা যায়?"

এই ব্যাপারটা সন্তুর জানা নেই। দরজা না থাকলে ভেতরে ঢোকা যাবে কী করে?

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তোর কি ধারণা পিরামিডের ভেতরটা ফাঁপা? ভেতরে সব ঘর-টর আছে?"

সন্তু আরও অবাক হয়ে গেল! ফাঁপা না হলে ভেতরে ঘর-টর থাকবে কী করে? অনেক ছবিতেই সে দেখেছে যে, পিরামিডের মধ্যে মস্ত-মস্ত হলঘরের মতন, তাতে অনেক জিনিসপত্র, মূর্তি, পাথরের কফিন ইত্যাদি থাকে। তা হলে কাকাবাবু এরকম বলছেন

কেন ?

কাকাবাবু দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না রে, পিরামিডের গায়ে দরজা নেই। ভেতরটা ফাঁপাও নয়, ভেতরে ঘর-টর কিচ্ছু নেই। পিরামিডগুলো হচ্ছে সলিড পাথরের ত্রিভুজ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তা হলে রাজা-রানিদের কবর কোথায় থাকত ?"

"সেগুলো বেশির ভাগই মাটির নীচে। শুধু রাজা-রানিদের সমাধি নয়, তাঁদের ব্যবহার করা অনেক জিনিসপত্রও সেখানে থাকত। এমনকী খাট-বিছানা পর্যন্ত। অধিকাংশই সোনার। ক্লিয়োপেট্রার শোবার খাট, চটিজুতো পর্যন্ত সোনার তৈরি ছিল। এই সব মূল্যবান জিনিসপত্র যাতে চোরে চুরি করে নিয়ে না যেতে পারে, তাই ওই সব সমাধিস্থানের ঢোকার পথটাও খুব গোপন রাখা হত। পিরামিডের গা হাতড়ে কেউ সারাজীবন খুঁজলেও ভেতরে ঢোকার পথ পাবে না।"

"তাহলে সাহেবরা পিরামিডের ভেতরে ঢুকল কী করে ?"

"পিরামিডের ভেতরে না, পিরামিডের নীচে। অনেক দূরে একটা সুড়ঙ্গের মুখ থাকে। সেখান দিয়ে যেতে হয়। সাহেবরা এক-এক করে সেই সব সুড়ঙ্গের পথ খুঁজে বার করেছে। খুব কষ্ট করে ঢুকতে হয়। স্যার ফ্লিন্ডার্স পেট্রি নামে একজন ইংরেজ এই সব আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত। এক-একটা পিরামিডের তলায় গিয়ে তিনি কত যে ধনরত্ন পেয়েছেন, তার ঠিক নেই। তবে স্যার ফ্লিন্ডার্সও প্রথম দু'একটা সমাধিস্থানের ভেতরে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁরও আগে চোরেরা অন্য দিক থেকে সুড়ঙ্গ কেটে এসে ভেতরে ঢুকেছিল। আমার ধারণা, মুফতি মহম্মদ এই স্যার ফ্লিন্ডার্সের দলে গাইডের কাজ করতেন। উনি অনেকদিন সাহেবদের কাছে প্রথমে মালবাহক কুলি, তারপর গাইডের কাজ করেছিলেন, তা তো

শুনেছিস মাস্টোর কাছে !"

"হ্যাঁ। তারপর গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবী হলেন।"

"সাহেবরা পিরামিডের সুড়ঙ্গ দিয়ে ভেতরে গিয়ে সমস্ত সোনার জিনিস আর দামি-দামি জিনিস বিদেশে নিয়ে যাচ্ছে দেখে এ-দেশের অনেক লোক চটে গিয়েছিল। মুফতি মহম্মদ তো নিজের চোখেই দেখেছেন, সাহেবরা মিশরের সম্পদ লুট করছে। তাই তিনি বিপ্লবী দল গঠন করেছিলেন, এই সব আটকাবার জন্য। হয়তো তিনি নিজেও কোনও-কোনও সমাধিস্থান থেকে সোনাদানা তুলে নিয়ে গিয়ে সেসব তাঁর দলের কাজে লাগিয়েছেন।"

"উনি ছবি এঁকে-এঁকে সেই সব সোনা কোথায় লুকোনো আছে তাই বুঝিয়ে গেছেন, তাই না?"

"না রে, আমি মিথ্যে কথা বলি না। আমি সে সবাইকে বলেছি যে, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছাপত্রে টাকা-পয়সা, সোনাদানার কথা কিছু নেই, তা সত্যিই। উনি সেসব কিছু জানিয়ে যাননি।"

ডাগো আবদাল্লা মুখ ফিরিয়ে বলল, "গিজার বড় পিরামিড তো এসে গেছে, এফেন্দি। এবার কোন্ দিকে যাব?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদির গাড়ি কোথায়?"

ডাগো বলল, "ওদের গাড়ি একটু আগেই পৌঁছে গেছে। সামনে থেমে আছে।"

"ওদের ওইখানেই থেমে থাকতে বলো। তুমি ডান দিকে চলো।"

আর কিছুক্ষণ বাদে আর-একটি মাঝারি আকারের পিরামিডের কাছে এসে কাকাবাবুর নির্দেশে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে কাকাবাবু চারদিকে তাকালেন। ধারেকাছে

কোনও লোকজন দেখা যাচ্ছে না। তবে বালির ওপর একটা গাড়ির চাকার দাগ রয়েছে। হয়তো আগের দিন কোনও টুরিস্টের গাড়ি এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "ডাগো, আমি এই পিরামিডের নীচে যাব।"

ডাগো কাকাবাবুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। করুণ হয়ে এল তার মুখখানা। আস্তে আস্তে বলল, "আপনি যাবেন, এফেন্দি ?"

কাকাবাবু হাসলেন। তারপর সন্তুর দিকে ফিরে বললেন, "কেন ও এই কথা বলছে জানিস ? আগেরবার যখন আমি ইজিপ্টে এসেছিলাম, তখন ডাগো সব সময় আমার সঙ্গে-সঙ্গে থাকত। ওকে নিয়ে আমি অনেক সমাধিতে নেমেছি। তখন আমার দুটো পা'ই ভাল ছিল। ডাগো ভাবছে, এখন এই খোঁড়া পা নিয়ে আমি আর নীচে নামতে পারব না !"

কাকাবাবু ডাগোকে বললেন, "তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নিশ্চয়ই পারব। আগেরবার আমরা এর মধ্যে একসঙ্গে নেমেছিলাম মনে নেই ?"

ডাগো বলল, "আপনার কষ্ট হবে, এফেন্দি !"

"তা হোক, তুমি কাজ শুরু করে দাও !"

গাড়ি থেকে কয়েকটা জিনিসপত্র নামানো হল। তিনটে শক্তিশালী টর্চ গুঁজে নেওয়া হল তিনজনের কোমরে। একটা ছোট ঝোলাব্যাগ কাকাবাবু চাপিয়ে দিলেন সন্তুর কাঁধে।

পিরামিড থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে ডাগো শুয়ে পড়ল এক জায়গায়। হাত দিয়ে বালি সরাতে লাগল। তারপর বেরিয়ে পড়ল একটা কাঠের পাটাতন। সেটা সরিয়ে ফেলতেই দেখা গেল একটা অন্ধকার গর্ত নেমে গেছে যেন পাতালে।

কাকাবাবু বললেন, "কাঠের পাটাতনের বদলে এখানে আগে

পাথর চাপা দেওয়া থাকত। তার ওপর অনেকখানি বালি ছড়িয়ে দিলে আর কারুর বুঝবার উপায় ছিল না। খুব সাবধানে নামবি কিন্তু সন্তু। একটু পা পিছলে গেলেই অনেক নীচে গড়িয়ে পড়ে যাবি।

ঠিক হল, ডাগো যাবে সবচেয়ে আগে, মাঝখানে কাকাবাবু, সবশেষে সন্তু। ডাগো একটা মোটা দড়ি আলগা করে জড়িয়ে দিল তিনজনের কোমরে। এখানে ক্র্যাচ নিয়ে গিয়ে কোনও লাভ নেই বলে কাকাবাবু সে-দুটো রেখে গেলেন বাইরে।

সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচের দিকে। দু'দিকের দেয়ালে দু'হাতের ভর দিয়ে বসে-বসে নামতে হয়। হাতের বেশ জোর লাগে।

সন্তু ভাবল, "নীচে নামবার কী অদ্ভুত ব্যবস্থা। অবশ্য হাজার হাজার বছর আগে এই ব্যবস্থাটাই বোধহয় সবচেয়ে সুবিধেজনক ছিল।

কাকাবাবুর যে দারুণ কষ্ট হচ্ছে তা বুঝতে পারছে সন্তু। ওঁর ভাঙা পা'টার ওপরেও জোর পড়ছে কিনা। মাঝে-মাঝে কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "তুই ঠিক আছিস তো, সন্তু?" কাকাবাবুর মুখ ভর্তি চন্দনের ফোঁটার মতন ঘাম।

ওপরের আলো খানিকটা মাত্র ভেতরে ঢোকে, তারপরেই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। ডাগো কী কায়দায় যেন একটা টর্চ জ্বেলে বগলে চেপে আছে। আর মাঝে-মাঝে আরবি ভাষায় কী যেন বলে উঠছে। হয়তো কোনও প্রার্থনামন্ত্র!

মিনিট দশেক পরে ওরা পৌঁছে গেল সমতল জায়গায়। ঘড়িতে দশ মিনিট কাটলেও মনে হয় যেন কয়েক ঘন্টা লেগে গেছে।

তিনটে টর্চের আলোয় দেখা গেল সেখানে একটি চৌকো ছোট

ঘর। ঘরটা একেবারে খালি। দেওয়ালেও কোনও ছবি নেই। ঘরের একটা দেওয়ালের নীচের দিকে একটি চৌকো গর্ত। তার মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ। সেই পথ খানিকটা যাবার পর আর-একটি দেওয়াল, সেই দেওয়ালের গায়ে একটি লোহার দরজা। দেখলেই বোঝা যায়, সেই দরজাটা নতুন বসানো হয়েছে, আগে অন্য কিছু ছিল।

দরজাটা ঠেলা দিতেই খুলে গেল। তারপরই একটি বিশাল হলঘর। এখানকার দেওয়ালে বড়-বড় ছবি আঁকা। কিন্তু জিনিসপত্তর কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, "সব নিয়ে গেছে। আগেরবার এসেও অনেক কিছু দেখেছিলাম। তাই না, ডাগো ?"

ডাগো বলল, "হ্যাঁ, এফেন্দি। কিছুই থাকে না। চোরেরা সব নিয়ে নেয় বলে গভর্নমেন্ট এখন নিজেই তুলে নিয়ে গিয়ে মিউজিয়ামে রাখে।"

কাকাবাবু বললেন, "বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না। ডাগো, সেই ল্যাবিরিন্থটা কোথায় ?"

ডাগো বিস্মিতভাবে বলল, "সেটাতেও যাবেন ?"

"হ্যাঁ। সেটার জন্যই তো এসেছি।"

"আপনার আরও কষ্ট হবে। এক কাজ করি, এফেন্দি। আমি আপনাকে পিঠে করে নিয়ে যেতে পারি।"

"তার দরকার হবে না। তুমি পথটা খুঁজে বার করো। আমার জায়গাটা ঠিক মনে পড়ছে না।"

হলঘরটা পার হয়ে এক জায়গায় এসে ডাগো একটা চৌকো পাথরের স্ল্যাব সরাল। তার মতন শক্তিশালী লোক ছাড়া অতবড় পাথর সরাতে যে-সে পারবে না। তারপর একটা ছোট গোল জায়গা। সেখানে মেঝেতে শুয়ে পড়ে সে আবার একটা পাথরের

পাটাতন সরিয়ে ফেলল। এখানে আবার আর-একটা সুড়ঙ্গ।

কাকাবাবু বললেন, "এইখানে আমাদের যেতে হবে, সন্তু।"

তারপর তিনি ডাগোকে বললেন, "আর তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ফিরে যাও!"

দারুণ চমকে উঠে ডাগো বলল, "কী বলছেন, এফেন্দি? আমি যাব না? আমাকে বাদ দিয়ে আপনি এই বাচ্চাকে নিয়ে যাবেন কী করে?"

"ঠিক পেরে যাব। তুমি বড় হলটায় অপেক্ষা করো, কিংবা ওপরেও উঠে যেতে পারো। আমরা ফেরার সময় তোমাকে ডাকব!"

"না, না, না, তা হয় না! আপনাকে এখানে ফেলে রেখে গেলে হানি আলকাদি আমায় আস্ত রাখবে না!"

"হানি আলকাদির সঙ্গে আমার এই রকমই কথা আছে। আমি যা দেখতে যাচ্ছি, তা আমি দেখার আগে, অন্য কেউ জানতে পারবে না। মুফতি মহম্মদের এটা আদেশ। এই আদেশ তো সকলকে মানতেই হবে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, ডাগো। তুমি আমাদের যা উপকার করলে, তার কোনও তুলনা নেই। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করে আমি এখানে আসতে পারতুম না।"

ডাগো মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

সন্তুর কাঁধে হাত দিয়ে কাকাবাবু ঢুকে পড়লেন সেই ল্যাবিরিন্থের মধ্যে।

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, সন্তু। ভেতরটা খুব আঁকাবাঁকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই মুখে গুঁতো লাগবে। আগেরবার আমার নাক থেঁতলে গিয়েছিল। এখন কি বুঝতে পারছিস যে, আমাদের মাথার ওপরে রয়েছে একটা বিরাট

পিরামিড ?

সন্তুর বুক টিপটিপ করছে। মাটির কত নীচে, জমাট অন্ধকার ভরা এক সুড়ঙ্গ। আর কি ওপরে ওঠা যাবে ? যদি হঠাৎ একটা পাথর ভেঙে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যায় ? ডাগো সঙ্গে থাকায় তবু খানিকটা ভরসা ছিল।

সন্তুর কাঁধ ধরে কাকাবাবুকে লাফিয়ে-লাফিয়ে আসতে হচ্ছে। সন্তু টর্চ জ্বেলে এগোচ্ছে খুব সাবধানে। একটুখানি অন্তর-অন্তরই সুড়ঙ্গটা বাঁক নিয়েছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভয় পাচ্ছিস নাকি রে, সন্তু ?"

সন্তু শুকনো গলায় বলল, "না !"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা বুঝতে পারছিস ?"

"না।"

"এক-একটা সমাধিস্থান খুব গোপন রাখা হত। কেন যে এত গোপনীয়তা তা জানা যায় না। হয়তো দামি জিনিসপত্র অনেক বেশি রাখা হত সেখানে। এটা সেইরকম একটা গোপন সমাধিতে যাবার পথ। কত কষ্ট করে এরকম সুড়ঙ্গ বানিয়েছে। হয়তো এই সমাধিতে যাবার আরও কোনও রাস্তা আছে, যা আমরা এখনও জানি না। রাজা-রানিরা কি এত কষ্ট করে যেতেন ?"

"আমরা কোন্ সমাধিতে যাচ্ছি ?"

"রানি হেটেফেরিসের গল্প তোকে বলেছিলুম, মনে আছে ?"

"হ্যাঁ, সেই যে কফিনের মধ্যে যাঁর মমি খুঁজে পাওয়া যায়নি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। লোকের ধারণা, এই জায়গাটা ভুতুড়ে। সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাওয়া গেছে, আবার মাঝে-মাঝে সেটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। তোর ভূতের ভয় নেই তো ?"

"অ্যাঁ ? না !"

"মুফতি মহম্মদ নামে একজন বৃদ্ধ কী সব ছবি এঁকেছিলেন, তা

দেখে আমাদের কি এত কষ্ট করে এত দূরে আসার কোনও দরকার ছিল, বল ?"

সন্তু এ-কথার কী উত্তর দেবে ! সে কিছুই বলল না ।

কাকাবাবু আবার বললেন, "আমি এলুম কেন জানিস ? ওই যে মুফতি মহম্মদ নির্দেশ দিলেন, তুমি আগে নিজে যাচাই করে দেখো, সেইজন্যই আমার কৌতূহল হল । এটা যেন বৃদ্ধের এক চ্যালেঞ্জ !"

টর্চের আলো এবারে একটা ফাঁকা জায়গায় পড়ল । সুড়ঙ্গটা শেষ হয়ে গেছে ! সুড়ঙ্গটা খুব বেশি লম্বা নয় ।

ফাঁকা জায়গাটিতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে । সেই সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার পর একটি বেশ বড় চৌকো ঘর ।

কাকাবাবু বললেন, "এই হল রানি হেটেফেরিসের সমাধিস্থান । এক সময় নাকি এখানে অতুল ঐশ্বর্য ছিল । একজন রানির যত জিনিস ব্যবহারে লাগে, সেই সব কিছু । ওরা বিশ্বাস করত কিনা যে, রাজা-রানিরা আবার হঠাৎ একদিন বেঁচে উঠতে পারে । তখন সব কিছু লাগবে তো !"

ঘরটার ঠিক মাঝখানে একটি কারুকার্য-করা পাথরের কফিন । আরও তিন-চারটে কফিন ছড়ানো রয়েছে এদিক-ওদিকে ।

বড় কফিনটা দেখিয়ে কাকাবাবু বললেন, "এই হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের সারকোফেগাস । তার আগে দেখা যাক, এর মধ্যে রানির মমি আছে কি না ! যদি থাকে, তা হলে দারুণ একটা আবিষ্কার হবে ।"

সারকোফেগাসের ওপরে রানির ছবি আঁকা । কাকাবাবুর সঙ্গে ধরাধরি করে সন্তু ঢাকনাটা সরিয়ে ফেলল ।

ভেতরটা ফাঁকা !

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "জানতুম।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "অন্য কফিনগুলো খুলে দেখব?"

"কোনও লাভ নেই। পৃথিবীর নানা দেশের মিউজিয়ামে মমিগুলো ভাল দামে বিক্রি হয়। চুরি যাবার ভয়ে সব মমি সেইজন্য ওপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

সন্তু টর্চের আলো ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগল দেওয়ালগুলো। প্রত্যেক দেওয়ালেই অসংখ্য ছবি। এইগুলোই হিয়েরোগ্লিফিকস। বোধহয় রানির জীবনকাহিনী লেখা আছে। কত শিল্পী, কত পরিশ্রম করে ওই সব ছোট-ছোট ছবি এঁকেছে। কাকাবাবুও ঘুরে-ঘুরে দেওয়ালগুলো পরীক্ষা করতে-করতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন।

"এইবার সন্তু, মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা তোকে জানাতে হবে। কারণ, তোর সাহায্য ছাড়া এরপর আর কিছু করার সাধ্য নেই। তুই দেখা মানেই আমার দেখা।"

সন্তু ছিল উল্টো দিকের দেওয়ালের কাছে। সে তাড়াতাড়ি এদিকে চলে এল!

"কাকাবাবু, আমি অনেকটা আন্দাজ করেছি। এই ঘরে ঢুকেই বুঝতে পেরে গেছি।"

"তুই বুঝতে পেরে গেছিস? কী বুঝেছিস শুনি?"

"রানি হেটেফেরিসের মমি এখানেই কোথাও লুকোনো আছে। আর সেই লুকোনো জায়গাতেই মহম্মদ সোনা আর টাকাপয়সা লুকিয়ে রেখেছেন।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন সন্তুর দিকে। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "অনেকটা ঠিকই ধরেছিস তো। তবে টাকাপয়সার কথা নেই এর মধ্যে। মুফতি মহম্মদের শেষ ইচ্ছের কথা জানলে অনেকে ভাববে পাগলামি। উনি ছবি এঁকে

যা জানাতে চাইছিলেন, তা হল এই : উনি খুব সংক্ষেপে লিখেছিলেন, আমি তোকে বুঝিয়ে বলছি। উনি এক সময় সাহেবদের কাছে গাইডের কাজ করতে। সেই সময়েই আল বুখারি নামে আর-একজন গাইডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। আল বুখারি অনেকগুলো পিরামিডের নীচে এবং গোপন সমাধিস্থানে ঢোকার রাস্তাও আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু সেইসব আবিষ্কারের কৃতিত্ব সাহেবরাই নিয়ে নিত। একজন সাহেবকে জব্দ করার জন্যই আল বুখারি মুফতি মহম্মদের সাহায্য নিয়ে রানি হেটেফেরিসের মমি এক জায়গায় লুকিয়ে রাখে। মজা করবার জন্য ওরা সেই মমিটাকে মাঝে-মাঝে বার করে এনে সারকোফেগাসের মধ্যে রেখে দিত, মাঝে-মাঝে আবার সরিয়ে ফেলত। সেই থেকে ভূতের গল্প রটে যায়। এ রকম ব্যাপার মাত্র দু'তিনবারই হয়েছিল। কিন্তু লোকে বিশ্বাস করত যে, রানির মমি প্রত্যেক বছর একবার করে ফিরে আসে। যাই হোক, আল বুখারি একটা দুর্ঘটনায় মারা যায়, মুফতি মহম্মদ গাইডের কাজ ছেড়ে বিপ্লবীদের দলে যোগ দেন। সেই থেকে মমিটা লুকোনো অবস্থাতেই আছে। মৃত্যুর আগে মুফতি মহম্মদ জানিয়ে দিতে চান যে, সেটা কোথায় আছে। কিন্তু এর মধ্যে যদি অন্য কেউ সেই গোপন জায়গাটা জেনে ফেলে মমিটা সরিয়ে ফেলে থাকে, তা হলে মুফতি মহম্মদ মিথ্যেবাদী হয়ে যাবেন। সেইজন্যই তিনি আগে আমাকে যাচাই করে নিতে বলেছেন।"

"সেই লুকোনো জায়গাটা কোথায় ?"

"সেটা তোকে খুঁজে বার করতে হবে। এই দ্যাখ, এই দেওয়ালের গায়ে মাঝে-মাঝে খাঁজ কাটা আছে। এই খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে তুই ওপরে উঠতে পারবি ? তোর কাঁধের ব্যাগটাতে দ্যাখ শক্ত নাইলনের দড়ি, লোহার হুক এই সব আমি এনেছি, যদি

কাজে লাগে ভেবে।”

সন্তু ব্যাগ খুলে জিনিসগুলো বার করল। তারপর বলল, “আমার ও-সব লাগবে না, আমি এমনিই উঠতে পারব।”

খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে সন্তু দেওয়াল বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

কাকাবাবু টর্চের আলো ফেলে বললেন, “ওই যে রানির ছবি দেখছিস, এরপর ডান দিকে পরপর নটা ছবি গুনে যা! গুনেছিস? এইবারে দশ নম্বর ছবিটার ওপর জোরে ধাক্কা দে।”

সন্তু ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই হল না।

কাকাবাবু বললেন, “আরও জোরে ধাক্কা দিতে হবে। আল বুখারি আর মুফতি মহম্মদ দু'জনেই গাঁট্টাগোঁট্টা জোয়ান ছিলেন নিশ্চয়ই। তা ছাড়া বহু বছর জায়গাটা খোলা হয়নি!

সন্তু প্রাণপণ শক্তিতে দুম-দুম করে ধাক্কা দিতে লাগল। তাও কিছুই হল না।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, “দ্যাখ তো, ওই এক থেকে দশ নম্বর ছবির মতন ছবি তোর মাথার কাছে ছাদেও আঁকা আছে কি না!”

“হ্যাঁ, আছে।”

“ওইখানে ধাক্কা দে!”

এবারে ছাদের সেই জায়গাটায় ধাক্কা দিতেই সন্তুর হাত অনেকখানি ভেতরে ঢুকে গেল। সেখানকার একটা পাথর ভেতরে সরে গেছে। সেখানে আরও ধাক্কা দিতে দিতে একজন মানুষ গলে যাবার মতন জায়গা হয়ে গেল।

“টর্চ জ্বালতে পারবি? দ্যাখ তো, ওখানে কী আছে?”

“মেজেনিন ফ্লোরের মতন জায়গাটা। ভেতরে একটা কফিন আছে।”

“ওইটাই খুলে দেখতে হবে। ভেতরে ঢুকতে পারবি তো?

খুব সাবধানে।”

সন্তু মাথা গলাতেই নীচে বেশ জোরে একটা শব্দ হল। সন্তু চমকে গিয়ে আবার মাথাটা বার করে আনল। নীচের দিকে তাকিয়ে যা দেখল তাতে তার রক্ত হিম হয়ে গেল একেবারে।

যেখানে শব্দটা হয়েছিল, কাকাবাবু টর্চের আলো ঘুরিয়েছেন সেই দিকে। সেখানে একটা কফিনের ঢাকনা খুলে গেছে। তার মধ্য থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে একটা মূর্তি। একটা মমি যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সেই মূর্তি দেখে টর্চসুদ্ধু কাকাবাবুর হাতটাও কেঁপে গেল একবার। তারপর তিনি অস্ফুট গলায় বললেন, “আল মামুন!”

সন্তুও এবার চিনতে পারল। কিন্তু আল মামুন এখানে আগে থেকেই এল কী করে? কাকাবাবু তো কাউকেই বলেননি যে, তিনি কোথায় যাবেন।

আল মামুনের গায়ে একটা সাদা কাপড় জড়ানো। সেটা খুলে ফেলে সে একটা লম্বা ছুরি বার করল। তারপর হিংস্র গলায় বলল, “বিদেশি কুকুর! নিমকহারাম! আমি কলকাতায় গিয়ে তোর সঙ্গে দেখা করেছি। আমি দিল্লিতে মুফতি মহম্মদের সঙ্গে তোদের দেখা করিয়ে দিয়েছি। আর তুই ওই কুত্তা হানি আলকাদির দলে যোগ দিয়েছিস?”

কাকাবাবু অনেকটা আপন মনে বললেন, “একটাই ভুল করেছি আমি। মিউজিয়ামের কিউরেটর মাস্টোর কাছে রানি হেটেফেরিসের কথা বলে ফেলেছিলাম। সে বুঝি তোমার দলে, আল মামুন? কিংবা জোর করে তার কাছ থেকে কথা আদায় করে ফেলেছ! তুমি এত কষ্ট করে এখানে কেন এলে আল মামুন! মুফতি মহম্মদের যদি লুকোনো টাকা পয়সা কিছু থাকেই, তুমি তো তার অর্ধেক ভাগ পাবে!

"অর্ধেক ! ওই শয়তানটাকে আমি অর্ধেক দেব ? আমি মুফতি মহম্মদের উত্তরাধিকারী। আমি তার সম্পদের সন্ধান পেয়ে গেছি। এখন তোমাকে আর ওই খোকাটাকে আমি এখানেই শেষ করে দিয়ে যাব। এই সম্পদের কথা পৃথিবীর আর কেউ জানবে না !"

"তুমি আমাদের খুন করবে ? তুমি ধর্মভীরু লোক, এরকম একটা অন্যায় করলে তোমার বিবেকে লাগবে না ?"

"কেউ দেখবে না, কেউ জানবে না, তাতে আবার বিবেকের কী আসে যায় !"

"আল মামুন, তোমার মতন খুনিদের আমি কিন্তু খুব কঠিন শাস্তি দিই !"

আল মামুন ছুরি তুলে এগিয়ে আসতেই কাকাবাবু মাটি থেকে নাইলনের দড়িটা তুলে নিলেন। সন্তু ভাবল; ওপর থেকে সে আল মামুনের মাথার ওপর লাফিয়ে পড়বে কি না !

কাকাবাবু দড়িটা নিয়ে শপাং করে চাবুকের মতন শব্দ করে বললেন, "আগেকার দিনে তলোয়ার আর চাবুকের লড়াইয়ের কথা শোনোনি ?"

বলেই তিনি চাবুকের মতন সেই দড়ির এক ঘা কষালেন আল মামুনের মুখে।

লড়াইটা শেষ হতে এক মিনিটও লাগল না। লম্বা দড়ির সঙ্গে ছুরি দিয়ে আল মামুন লড়তে পারলই না মোটে। কাকাবাবু তাকে অনবরত মারতে লাগলেন। আল মামুনের হাত থেকে ছুরি খসে পড়ে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল সে। কাকাবাবু দড়ির ফাঁস তার গলায় লাগিয়ে হ্যাঁচকা টান দিতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। দড়ির বাকি অংশটা দিয়ে কাকাবাবু তার হাত-পা বেঁধে ফেললেন।

তারপর যেন কিছুই হয়নি এই ভঙ্গিতে হাত নেড়ে তিনি সন্তুকে বললেন, "যা, ভেতরটা দেখে আয়।"

সন্তুর পা কাঁপছিল। নিজেকে একটুখানি সংযত করে সে টর্চটা মুখে চেপে নিল, তারপর দু'হাতে ভর দিয়ে মাথাটা গলাল ভেতরে।

ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে পড়ল রিনির মুখটা। রিনি তাকে ঠাট্টা করেছিল। বলেছিল গরুর শিঙের ওপর বসে থাকা একটা মশা! এখন সে একা মুফতি মহম্মদের সম্পদ আবিষ্কার করতে যাচ্ছে। কলকাতার পিকনিক গার্ডেনসের সেই থানাটার কথাও তার মনে পড়ে গেল এক ঝলক। সেই দারোগা যদি তাকে এই অবস্থায় দেখতেন!

ভেতরে ঢুকে গিয়ে সন্তু উবু হয়ে বসে টর্চ জ্বালল। তার গা ছমছম করছে। কেন যেন তার ধারণা হল, এখানে একটা অজগর সাপ থাকতে পারে। কাশ্মীরের সেই শুকনো কুয়োটার মধ্যে যে-রকম ছিল।

কিন্তু সে-সব কিচ্ছু নেই। একটা শুধু কফিন, আর এক পাটি চটি পড়ে আছে। আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে সে কফিনের ঢাকনা খুলল।

খুলেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। সেখানে সত্যিই একটা মমি রয়েছে। সন্তু ভূতের ভয় পায় না, তবু তার হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপছে। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারছে না সে।

তার দৃঢ় বিশ্বাস এই মমির গায়ে জড়ানো ব্যান্ডেজের মধ্যেই কিংবা এর নীচে প্রচুর ধনরত্ন আছে। কিন্তু সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্য সে হাত তুলতেই পারছে না।

অতি কষ্টে সন্তু চোখ বুজে হাতটা ছোঁয়াল মমির গায়ে। এবারে তার কাঁপুনি থেমে গেল। ভাল করে মমিটা পরীক্ষা

করল। কয়েকখানা হাড় ছাড়া আর কিছুই টের পাচ্ছে না। মমির তলাতেও কিছু নেই।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সন্তু বুঝে গেল, তার আশা ব্যর্থ হয়েছে। ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখা থাকলে তা তো একটু-আধটু হবে না। অনেক হবার কথা। থাকলে ঠিকই টের পাওয়া যেত।

হতাশ ভাবে ফিরে এসে সন্তু গর্তটাতে মুখ বাড়িয়ে বলল, "কাকাবাবু, কিছু নেই।"

"মমি নেই?"

"হ্যাঁ, মমি আছে। রানির মমিই মনে হচ্ছে, কিন্তু টাকাপয়সা বা সোনা-টোনা একটুও নেই!"

"মুফতি মহম্মদ তো টাকাপয়সার কথা বলেননি! তোকে আর-একটা কাজ করতে হবে। দ্যাখ্ তো, ওই ঘরের দেওয়ালে বা ছাদে বা কফিনের গায়ে কোনও ছবি আঁকা আছে কি না?"

সন্তু দেখে এসে বলল, "হ্যাঁ, আছে। কফিনের ঢাকনার ভেতরের দিকে পাঁচটা ছোট ছোট ছবি আছে।"

কাকাবাবু ঝোলাব্যাগটা সন্তুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এর মধ্যে কাগজ-কলম আছে। তুই তো একটু-আধটু ছবি আঁকতে পারিস, খুব সাবধানে ওই ছবিগুলো কপি করে নিয়ে আয় তো!"

ছবিগুলো কপি করতে সন্তুর আরও দশ মিনিট লাগল। তারপর চটিজুতোটা কুড়িয়ে নিয়ে সে নেমে এল। জুতোটা চামড়া বা রবারের নয়। কোনও ধাতুর। সোনারও হতে পারে। ওপরে শ্যাওলা জমে গেছে।

কাকাবাবু আল মামুনের মুখের ওপর টর্চ ফেলে বললেন, "তোমাকে আমি খুলে দিচ্ছি না!"

আল মামুন বলল, "আমাকে বাঁচাও। তোমাকে আমি দশ লাখ টাকা দেব!"

"তুমি আমাদের খুন করতে চেয়েছিলে! তার বদলে তুমি অন্তত একটা দিন মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করো!"

সন্তুকে নিয়ে কাকাবাবু সেই হলঘর থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়লেন সুড়ঙ্গে। সেটা পার হতেই ডাগো আবদাল্লাকে দেখতে পাওয়া গেল। সে অধীরভাবে ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। তারপর আর ওপরে উঠতে কোনও অসুবিধে হল না।

হানি আলকাদি কোথা থেকে ছুটে এসে কাকাবাবুর হাত জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল, "মিঃ রায়চৌধুরী, ইউ গট ইট?"

কাকাবাবু বললেন, "শোনো, মনটা শক্ত করো। দুঃসংবাদ শুনে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে যেও না। মুফতি মহম্মদের গোপন কথা হচ্ছে রানি হেটেফেরিসের মমি। সেটা আবিষ্কারের কৃতিত্ব তুমি নাও বা যে-ই নিক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। সেখানে টাকাপয়সা বা অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া যায়নি। এই এক পাটি চটি পাওয়া গেছে, বোধহয় এটা সোনার তৈরি। কে এটা ফেলে গেছে জানি না। এর অর্ধেক তুমি ইচ্ছে করলে আল মামুনকে দিতে পারো। সে অবশ্য নীচে শুয়ে আছে। বিকেলের দিকে কোনও লোক পাঠিয়ে তাকে উদ্ধার করতে হবে।"

হানি আলকাদি রাগের চোটে চটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল দূরে!

কাকাবাবু বললেন, "আমার এখন বিশ্রাম দরকার একটু। আমি ক্লান্ত। এখানে একটা রেস্ট হাউস তৈরি হয়েছে না?"

আগের রাতে ঘুম হয়নি, তার ওপর এত উত্তেজনা ও পরিশ্রম। সন্তু আর কাকাবাবু দু'জনেই ঘুমোল প্রায় সন্ধে পর্যন্ত।

সন্তু জেগে উঠে দেখল, রিনি, সিদ্ধার্থ বিমান সবাই এসে বসে আছে। সিদ্ধার্থ বিমানের কাছে খবর পেয়ে কাল রাতেই এখানকার সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। আজ তারা খুঁজতে-খুঁজতে গিজাতে এসে পৌঁছেছে।

রিনি বলল, "সন্তু, সব ঘটনা আমি আগে শুনব। তার আগে তুই আর কাউকে বলতে পারবি না!"

কাকাবাবু ঠিক করলেন, তখুনি কায়রোর দিকে রওনা হবেন। ডাগো আবদাল্লাকে তিনি অনেক টাকা বখশিশ দিলেন। তারপর তাকে বললেন, একটু পরেই সে গিয়ে যেন আল মামুনকে মুক্তি দিয়ে আসে।

তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "হানি আলকাদি কোথায়?"

ডাগো বলল, "সে তো চলে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার কাছ থেকে সে বিদায় না নিয়ে চলে গেল? হতেই পারে না। তার খোঁজ নিয়ে দ্যাখো।"

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই তাকে এক আরবের বাড়িতে পাওয়া গেল। সেও ঘুমোচ্ছিল। মনের দুঃখেও তো মানুষের খুব ঘুম পায়।

কাকাবাবু তাকে একলা একটু দূরে ডেকে নিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "আমি চলে যাচ্ছি। তোমার কোনও উপকার করতে পারলুম না, সেজন্য দুঃখিত।"

হানি আলকাদি বিষণ্ণভাবে বলল, "তবু যে তুমি মুফতি মহম্মদের কথা রাখবার জন্য এত দূরে ছুটে এসে এত কষ্ট করলে, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কাগজ বার করলেন। তারপর বললেন, "রানির লুকোনো কফিনের গায়ে কয়েকটি ছবি আঁকা আছে। সেগুলো আসলে সংকেত-লিপি। সেটা আমি তোমার জন্য অনুবাদ করে দিয়েছি। তাতে লেখা আছে, ফারাও আসেমহেট তৃতীয়'র সমাধিস্থান। তৃতীয় কক্ষ। ডান দিকের দেওয়ালের ওপর দিকে ঠিক পাঁচটি ছবি আঁকা আছে। আমার মনে হয়, সেই ছবি আর এই কফিনের গায়ের ছবি মুফতি মহম্মদের

আঁকা। খুব সম্ভবত সেখানে কিছু লুকিয়ে রাখা আছে। রানির মমির কথা বলে তিনি সেই কথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। সেখানে কী আছে না আছে তা আমি আর দেখতে চাই না। তুমি গিয়ে দ্যাখো, যা আশা করছ তা হয়তো ওখানেই পেতে পারো। গুড লাক!"

আনন্দে চকচক করে উঠল হানি আলকাদির চোখ। সে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল কাকাবাবুকে।